সবচেয়ে বড় গুনাহ
শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?

প্রফেসর ডা: মো: মতিয়ার রহমান
FRCS (Glasgow)
প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন, ঢাকা, বাংলাদেশ
বিভাগীয় প্রধান, সার্জারী বিভাগ
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
১১, শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ স্মরণী (৮ম তলা)
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপেক্স
ঢাকা, বাংলাদেশ-১২১৭।
www.qrfbd.com
Email: qrfbd2012@gmail.com
ফোন: ০২-৯৩৪১১৫০, মোবাইল: ০১১৯৯-৪৭৪৬১৭

প্রকাশকাল
প্রথম মুদ্রণ : জানুয়ারী ২০০৯
২য় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী ২০১৩

কম্পিউটার কম্পোজ
Q R F

মুদ্রণ ও বাঁধাই
অথেনটিক প্রিন্টার্স
অফিস: ১৪২/২ আরামবাগ (১ম তলা)
মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
ফোন: ৭১৯২৫৩৯, মোবাইল: ০১৭২০১৭৩০১০

মূল্য : ৭৫.০০ টাকা

সূচীপত্র

ক্র. নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
০১	*ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম*	০৫
০২	*পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ*	০৯
০৩	আল্লাহর দেয়া তিনটি উৎস ব্যবহার করে যেকোন বিষয় নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা	১৬
০৪	মূল বিষয়	১৭
০৫	সবচেয়ে বড় গুনাহর বিষয়ে Common sense এর তথ্য (উদাহরণ)	১৭
০৬	সবচেয়ে বড় গুনাহর বিষয়ে কুরআনের তথ্য	১৯
০৭	সবচেয়ে বড় গুনাহর বিষয়ে হাদীস	৪০
০৮	সবচেয়ে বড় গুনাহগার না হওয়ার জন্য কুরআনের যে পরিমান জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন	৪৮
০৯	সকলকে কুরআনের সাধারণ জ্ঞানী না বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী হতে হবে?	৫১
১০	চেষ্টার পরও কুরআনের সাধারণ জ্ঞানী না হতে পারলে কি শাস্তি পেতে হবে?	৫২
১১	শিরকের সংজ্ঞা, শ্রেণী বিভাগ ও বর্তমান বিশ্বে শিরক করার ব্যাপকতা	৫৩
১২	*শেষ কথা*	৫৬

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না,
নাকি তাদের অন্তরে তালা পড়ে গেছে?

সূরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ। আমি একজন বিশেষজ্ঞ সার্জন। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, ডাক্তারী বিষয় বাদ দিয়ে একজন ডাক্তার কেন এ বিষয়ে কলম ধরল? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশে-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি, ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হল, জীবিকা অর্জনের জন্য বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী করেছি। এখন যদি কুরআন মজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, ইংরেজি ভাষার বড় বড় বই পড়ে বড় ডাক্তার হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবখানি (কুরআন মজীদ) পাঠিয়েছিলাম, সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেব?

এ উপলব্ধিটি আসার পর আমি কুরআন মজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার অভাবটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মজীদ পড়তে যেয়ে দেখি, ইরাকে যে সব সাধারণ আরবী বলতাম, তার অনেক শব্দই ওখানে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মজীদ পড়তে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে ১, ২, ৫, ১০ আয়াত বা যতটুকু পারা যায়, বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি লাইনও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মজীদ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

পুরো কুরআন মজীদ তথা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখে। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দিচ্ছিল। সর্বোপরি, কুরআনের এই আয়াত আমাকে লিখতে বাধ্য করল–

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

অর্থ: নিশ্চয়ই যারা, আল্লাহ (তাঁর) কিতাবে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (পায়), তারা যেন পেট আগুন দিয়ে ভরে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(বাকারা/২: ১৭৪)

ব্যাখ্যা: কোন জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থ কিছু পাওয়া। ছোট ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড় ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড় কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্য- বাধ্যকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন, তিনি কুরআনে যে সব বিধান নাযিল করেছেন, ছোট ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো বলে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুনে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি একটি সাংঘাতিক দূর্ভাগ্য হবে। আর তাদের পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোট- খাট গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোট- খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআন জেনে তা গোপন করবে, তাদের তা করা হবে না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআন জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে, তা থেকে বাঁচার জন্য আমি ডাক্তার হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় সূরা আরাফের ২নং আয়াতটি আমার মনে পড়ল। আয়াতটি হচ্ছে-

كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ

অর্থ: এটা (আল- কুরআন) একটি কিতাব। এটি তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এ জন্য যে, এর বক্তব্য দ্বারা তুমি মানুষকে সতর্ক করবে, ভয় দেখাবে। তাই (কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে) তোমার অন্তরে যেন কোন প্রকার দ্বিধা- দ্বন্দ্ব, ভয়- ভীতি ইত্যাদি না আসে।

ব্যাখ্যা: কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ককারী সাধারণ মানুষের অন্তরে দুটো অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে-

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বুঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে অসামঞ্জস্যশীল বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন, দান- খয়রাত বা নজর- নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে ২য়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে, কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটো সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রাসূলের (সা:) মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন, মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা- দ্বন্দ্ব, ভয়- ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনই কুরআনের বক্তব্যকে লুকাবে না বা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (গাশিয়াহ: ২২, নিসা: ৮০) আল্লাহ রাসূল (সা:) কে বলেছেন, পৃথিবীর সকল মানুষ কখনই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই তুমি কুরআনের বক্তব্য (না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে) মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ন্যায় কাজ করা তোমার কাজ নয়। কুরআনের এ সব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই, আমার কথা বা লেখনীতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

আল- কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইল না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (যেখানে সিহাহ সিত্তার প্রায় সমস্ত হাদীস এবং তার বাইরেরও অনেক হাদীস উপস্থিত আছে) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বর্তমান লেখা আরম্ভ করি ০১.০৯.২০০৮ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআনিআ (কুরআন নিয়ে আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এবং কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন। কুরআনিআ অনুষ্ঠানটি প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম শুক্রবার সকাল ১০.০০ টায় অনুষ্ঠিত হয়।

নবী- রাসূল (আ:) বাদে পৃথিবীতে আর কেউ ভুল- ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ, যদি এই লেখায় কোনো ভুল- ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং সেটি সঠিক হলে, পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমত কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন- এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

ইসলামী জীবন বিধানে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি- আল- কুরআন (আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান), সুন্নাহ (আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা) ও Common sense (আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান)। পুস্তিকার জন্য এই তিনটি উৎস থেকেই তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক। যা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে, মাধ্যম তিনটিকে যথাযথভাবে ব্যবহারের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-

ক. আল- কুরআন (আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান)

কোন কিছু পরিচালনার মৌলিক বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হচ্ছে ঐটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়ারগণ কোন জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়গুলো সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়ে ভুল করে চরম দূর্ভোগে না পড়ে। এই বুদ্ধিটা ইঞ্জিনিয়ারগণ পেয়েছেন মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল বা কিতাব সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এটা আল্লাহ এ জন্য করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দূর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল- কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিল যে, রাসূল মুহাম্মদ

(সা:) এর পর আর কোন নবী- রাসূল (আ:) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল- কুরআনের বিষয়গুলো যাতে রাসূল (সা:) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর, সময়ের আবর্তে, মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোন কমবেশি না হয়ে যায়, সে জন্য কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূলের (সা:) মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হচ্ছে, সব কটি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোন বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উপস্থাপন করা হয়েছে অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যই ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষীগণ বলেছেন, কুরআনের তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করা। তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোন কথা নেই।

আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল- কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে এই পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. সুন্নাহ (আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান)

কুরআনের বক্তব্যগুলোর বাস্তব রূপ বা ব্যাখ্যা হল রাসূল (সা:) এর সুন্নাহ তথা রাসূল (সা:) এর কথা, কাজ ও সমর্থন। তাই কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা যদি কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। এ জন্য সুন্নাহকে এই পুস্তকে তথ্যের ২য় উৎস হিসাবে ধরা হয়েছে।

সুন্নাহর লিপিবদ্ধ রুপ হলো হাদীস গ্রন্থের 'হাদীস'। তবে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, সকল সুন্নাহই হাদীস কিন্তু সকল হাদীস সুন্নাহ নয়। তাই কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের বিপরীত হয়, তবে নির্দ্বিধায় সেই হাদীসটিকে মিথ্যা বা বানানো হাদীস অথবা তার প্রচলিত ব্যাখ্যাকে ভুল বলে

প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ যতই গুণান্বিত হোক না কেন। কারণ, কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত কথা বা কাজ রাসূল (সা:) কোনক্রমেই বলতে বা করতে পারেন না। পক্ষান্তরে কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবে সেই হাদীসটিকে শক্তিশালী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তার বর্ণনাকারীগণের মধ্যে কিছু দুর্বলতা থাকলেও।

কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা ছাড়াও রাসূল (সা:) আরো কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা সেগুলো কুরআনের কোন বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে ঐ বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীস দুর্বল হাদীসকে রহিত (Cancel) করে দেয়।

হাদীস নিয়ে বিস্তারিত আলেচনা করা হয়েছে- 'হাদীস শাস্ত্র মতে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কী?' নামক বইটিতে।

গ. Common sense (আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান)

আল- কুরআনের সূরা আশ- শামসের ৭- ১০ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন-

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوَّاهَا . فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا . قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا.

অর্থ: শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অত:পর তাকে ইলহামের মাধ্যমে পাপ ও সৎ কাজের জ্ঞান দিয়েছেন। যে তাকে উৎকর্ষিত করল সে সফল হল। আর যে তাকে অবদমিত করল সে ব্যর্থ হল।

ব্যাখ্যা: ৮ নং আয়াতখানিতে আল্লাহ্ বলেছেন, তিনি মানুষের মনে পাপ (ভুল) কাজ ও সৎ (সঠিক) কাজ 'ইলহাম' করেন। 'ইলহাম' শব্দের উৎপত্তি আরবী

(لَهْمٌ) শব্দ থেকে। এর অর্থ গিলে ফেলা বা গিলিয়ে দেয়া। আর পারিভাষিক অর্থে ইলহাম শব্দটির অর্থ হচ্ছে আল্লাহর তরফ থেকে কোন জ্ঞান বা তথ্যকে অবচেতনভাবে মানুষের মনের গোপন প্রদেশে জাগিয়ে দেয়া।

'ইলহাম' শব্দের এই পারিভাষিক অর্থ অনুযায়ী মানুষের প্রতি পাপকর্ম ও সৎকর্ম ইলহাম করার অর্থ দাঁড়ায়- প্রত্যেক মানুষের মন অতিপ্রাকৃতিকভাবে বা বিনা শিক্ষায় বুঝতে পারে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কোনটি ভুল বা অকল্যাণকর এবং কোনটি সঠিক বা কল্যাণকর। এ কথাটি যে সত্য, তা আমরা সকলেই অনুভব করে থাকি। আর অন্তরে আল্লাহ কর্তৃক ইলহাম হওয়ার মাধ্যমে (বিনাশিক্ষায়) অর্জিত হওয়া জ্ঞানকে, আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান, Common sense, عَقْلٌ বা বিবেক নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধি (বিবেক- বুদ্ধি) বলে।

অন্যদিকে ৯ ও ১০ নং আয়াত থেকে জানা যায় Common sense উৎকর্ষিত বা অবদমিত হতে পারে। আর তা হয়, সঠিক বা ভুল শিক্ষা ও পরিবেশের কারণে।

সূরা আনফালে বলা হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ...

অর্থ: হে মু' মিনগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চল তবে তিনি তোমাদের (সত্য ও মিথ্যা) পার্থক্যকারী (ক্ষমতা) দিবেন ...।

(আনফাল/৮ : ২৯)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'য়ালা এখানে বলেছেন মু'মিনরা যদি তাঁকে ভয় করে চলে তবে তিনি তাদের সত্য (সঠিক) ও মিথ্যা (ভুল) পার্থক্য করার ক্ষমতা বা শক্তি দিবেন। আল্লাহর দেয়া সেই সঠিক ও ভুল পার্থক্যকারী ক্ষমতা হলো Common sense, আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান, عَقْلٌ বা বিবেক- বুদ্ধি।

আর এই Common sense এর ব্যাপারে রাসূল (সা:) এর বক্তব্য হলো-

وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَ السَّلاَمُ لِوَابِصَةَ (رض) جِئْتَ تَسْاَلُ عَنِ الْبِرِّ وَ الاِثْمِ . قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَجَمَعَ اَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ. وَ قَالَ اِسْتَفْتِ

نَفْسَكَ وَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ثَلاَثًا. اَلْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالاِثْمُ مَا حَاكَ فِى النَّفْسِ وَ تَرَدَّدَ فِى الصَّدْرِ وَاِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ .

অর্থ: রাসূল (সা:) ওয়াবেছা (রা:) কে বললেন, তুমি কি নেকি (সঠিক) ও পাপ (ভুল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো: হ্যাঁ। অত:পর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে নিজের হাত বুকে মারলেন এবং বললেন, তোমার নফস ও অন্তরের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা কর। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন- যে বিষয়ে তোমার নফস ও অন্তর স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকী। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার মনে সন্দেহ- সংশয়, খুঁতখুঁত বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়।

(মাকতাবাতুশ শামেলাহ : মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- ১৮০৩৫; তিরমিজি ও বায়হাকী)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানি থেকে বুঝা যায়, ইসলামী জীবন বিধানে সঠিক কাজ হচ্ছে সেটি, যা করতে মন (অন্তর) স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে। আর ভুল হল সেটি যা করতে অন্তরে সন্দেহ- সংশয়, খুঁতখুঁত ব অস্বস্তি সৃষ্টি হয়।

তাহলে হাদীসখানি থেকে সহজে বুঝা যায় যে, মানুষের একটি মন আছে যা-

- ❖ সঠিক কাজ করলে বুঝতে পারে। তাই সে মন শান্তি পায়
- ❖ আবার ভুল কাজ করলেও বুঝতে পারে। তাই সে মন অস্বস্তি বা কষ্ট পায়।

মানুষের এই মনকেই 'বিবেক' বলে। আর বিবেকে ইলহাম হওয়ার মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জিত হয় সেটিই হলো আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান, Common sense বা বিবেক- বুদ্ধি।

হাদীসখানির শেষে থাকা, 'যদিও মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়' কথাটির মাধ্যমে রাসূল (সা:) জানিয়ে দিয়েছেন, কোন মানুষ যদি এমন কথা বলে যাতে Common sense সায় দেয় না তবে বিনা যাচাইয়ে তা মেনে নেয়া যাবে না। সে ব্যক্তি যত বড় মুফাস্সীর, মুহাদ্দীস, মুফতি, প্রফেসর, ডাক্তার, ইন্জিনিয়ার ইত্যাদি হোক না কেন।

আবার সূরা আশ- শামসের ৯ ও ১০ নং আয়াত ও অন্য হাদীস থেকে জানা যায় এবং সাধারণভাবে আমরা সকলেও জানি, Common sense পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তিত হয়। তাই Common sense বিরুদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে তা কুরআন- হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে। আবার Common sense সিদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করার আগে তাও কুরআন- হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

পবিত্র কুরআনে এই Common sense কে **عَقْلَ** বলা হয়েছে। এই **عَقْلَ** শব্দটিকে আল্লাহ- اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ ، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ، لاَ يَعْقِلُوْنَ ، اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ. ইত্যাদিভাবে মোট ৪৯ বার কুরআনে ব্যবহার করেছেন। শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন ইসলামকে জানা ও বুঝার জন্যে কুরআন ও সুন্নাহের সঙ্গে Common sense কে যথাযথভাবে ব্যবহার করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে অথবা ঐ কাজে Common sense না খাটানোর দরুন তিরস্কার করার জন্যে।

Common sense খাটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আল্লাহ এমনটি করেছেন। আর এটিকে আল্লাহ কী পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছেন, তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝা যায় নিম্নের ৩টি আয়াতের থেকে-

১. সূরা আনফালের ২২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُونَ.

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই সব বধির- বোবা লোক, যারা Common sense কে কাজে লাগায় না।

২. সূরা ইউনুস- এর ১০০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُونَ.

অর্থ: যারা Common sense প্রয়োগ করে কাজ করে না, তিনি তাদের উপর অকল্যাণ (ভুল) চাপিয়ে দেন।

৩. সূরা মুলকের ১০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ.

অর্থ: (জাহান্নামীরা) আরো বলবে, যদি আমরা (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনতাম অথবা Common sense কে (ইসলাম জানার জন্য যথাযথভাবে) ব্যবহার করতাম, তাহলে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হত না।

ব্যাখ্যা: আয়াতটিতে দোযখের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যে কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে- যদি তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনত অথবা ইসলাম জানার জন্য Common sense কে যথাযথভাবে ব্যবহার করত, তবে আজ তাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হতো না। কারণ Common sense কে কুরআন ও সুন্নাহর সাথে যথাযথভাবে ব্যবহার করলে তারা জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করতে পারত। আর সহজেই বুঝতে পারত যে, কুরআন ও সুন্নাহর (প্রায় সব) কথা Common sense সম্মত। ফলে তারা তা সহজে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে পারত। আর তাহলে তাদের দোযখে যেতে হত না। আয়াতখানি থেকে তাই বুঝা যায়, কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা দোযখে যাওয়ার একটা প্রাথমিক কারণ হবে।

তাই, Common sense এর রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি মূল উৎস হিসাবে নেয়া হয়েছে। তবে Common sense ব্যবহারের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে-

ক. আল্লাহর দেয়া সাধারণ জ্ঞান বা Common sense বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের দ্বারা পরিবর্তিত হয়, তবে একেবারে নি:শেষ হয়ে যায় না,

খ. সঠিক বা সম্পূরক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে Common sense উৎকর্ষিত হয়ে কুরআন- হাদীসের কাছাকাছি পৌঁছে যায় কিন্তু একেবারে সমান হয় না এবং

গ. কুরআন বা নির্ভুল হাদীসের কোন বক্তব্য যদি মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী না বুঝা যায় তবুও তাকে সত্য বলে নি:সন্দেহে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানুষের জ্ঞান একটি বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত কুরআনের কোন কোন আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝে না- ও আসতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে বলে আশা করি- –

১. রকেটে করে গ্রহ- উপগ্রহে অল্প সময়ে যাওয়ার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর রাসূলের (সা:) মেরাজ বুঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে।

২. সূরা যিলযাল- এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ ভাল কাজ করলে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন দেখানো হবে, আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (Video Recording) এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার আগ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই কাজ দেখানো শব্দটি সঠিকভাবে বুঝা সহজ ছিল না। তাই তাফসীরেও এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি, মানুষের ২৪ ঘণ্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাঁর রেকর্ডিং কর্মচারী (ফেরেশতা) দিয়ে

ভিডিও রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিস্কে(Computer disk) সংরক্ষিত রাখছেন এবং এটিই শেষ বিচারের দিন দেখিয়ে বিচার করা হবে।

৩. মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর (Developmental steps) সম্বন্ধে কুরআনের যে সকল আয়াত আছে, আগের তাফসীরকারকগণ তার সঠিক তাফসীর করতে পারেন নাই, বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তরে না পৌঁছার কারণে। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের বৃদ্ধির (Embryological development) জ্ঞান যতই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

Common sense নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে কুরআন, সুন্নাহ ও বাস্তবতা অনুযায়ী Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন' নামক বইটিতে।

কিয়াস ও ইজমা

কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক অর্থবোধক বা কুরআন ও সুন্নায় উল্লেখ নেই এমন বিষয়ে, কুরআন ও সুন্নাহর অন্য তথ্যের আলোকে, বিচক্ষণ (ফকিহ) ব্যক্তিদের জ্ঞান- বুদ্ধি (আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান এবং অর্জিত সাধারণ জ্ঞান) খাটিয়ে চিন্তা- গবেষণার মাধ্যমে উদঘাটন করা সিদ্ধান্ত (গবেষণার ফল)কে কিয়াস বলে। আর কোন বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফলাফল এক হওয়া বা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলের একমত হওয়াকে ইজমা (Concensus) বলে। তাই সহজে বুঝা যায় কিয়াস বা ইজমা ইসলামের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস নয়। কিয়াস ও ইজমা হলো আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি (কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense) ব্যবহার করে কোন বিষয়ে, বিচক্ষণ ব্যক্তিদের নেয়া একক বা সামষ্টিক সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ কিয়াস ও ইজমার মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহর সাথে আল্লাহ প্রদত্ত তৃতীয় উৎস Common sense ও উপস্থিত আছে। ইজমাকে ইসলামী জীবন বিধানের একটি দলিল হিসাবে ধরা হলেও মনে রাখতে হবে, ইজমার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মত অন্য যে কোন বিষয়েই তা হতে পারে।

পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এ ব্যাপারে কিয়াস করার সুযোগ নেই।

আল্লাহর দেয়া তিনটি উৎস ব্যবহার করে যেকোন বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা

যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে, আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ, Common sense ব্যবহারের নীতিমালাটি মহান আল্লাহ সার- সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে। আর রাসূল (সা:)ও সুন্নাহর মাধ্যমে সে ক্রমধারাটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। নীতিমালাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, 'ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্য কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহারের নীতিমালা' নামক বইটিতে। তবে নীতামালাটির সংক্ষিপ্ত চলমান চিত্র এখানে উপস্থাপন করা হলো-

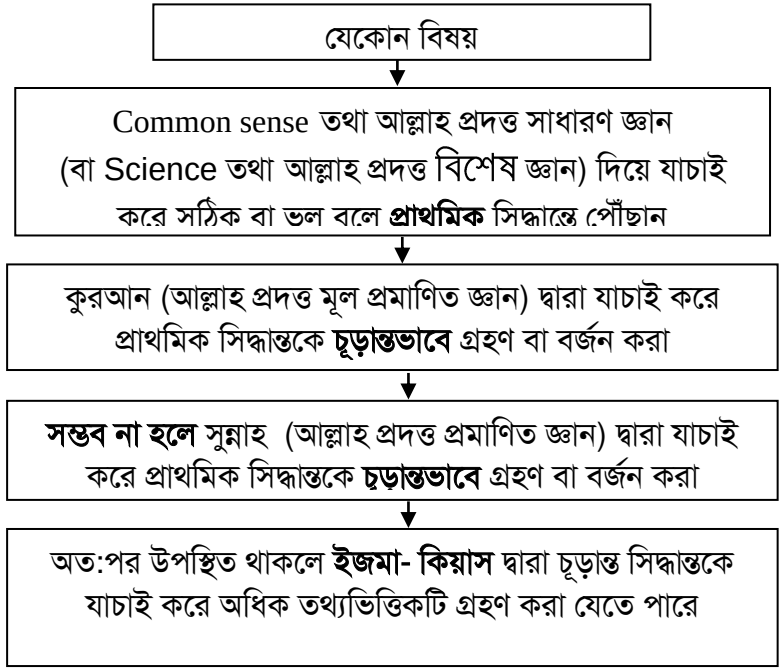

মূল বিষয়

একজন প্রকৃত মুসলিমকে সকল গুনাহ (অপরাধ) থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করতে হবে। তবে তাকে সর্বপ্রথম চেষ্টা করতে হবে সবচেয়ে বড় গুনাহটি হতে মুক্ত

থাকতে। সব থেকে বড় গুনাহটি হতে মুক্ত থাকতে চাইলে প্রথমে জানতে হবে সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি। বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয় সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি তবে তাদের প্রায় সকলে একবাক্যে উত্তর দিবেন 'শিরক করা'। অন্যদিকে যে সকল মুসলিম সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ ইত্যাদি আমলগুলো নিয়মিত বা অনিয়মিত পালন করেন তাদের অনেকে কুরআন পড়তেই পারেন না। যারা পড়তে পারেন তাদের অধিকাংশের পড়া সঠিক হয় না। যাদের পড়া সহীহ হয় তাদের অধিকাংশের কুরআনের তেমন জ্ঞান নেই। এখান থেকে বুঝা যায় ঐ সকল মুসলিম মনে করেন যে, উল্লিখিত আমলগুলো না করার গুনাহ কুরআনের জ্ঞান না থাকার গুনাহর চেয়ে অনেক বেশী।

শিরক শব্দের অর্থ হচ্ছে অংশীদারিত্ব। তাই আল্লাহর সাথে শিরক করার অর্থ হচ্ছে, যে সব বিষয় শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত, সে সব বিষয়ে অন্য কারো অংশীদারিত্ব আছে এ কথা স্বীকার করা অথবা বাস্তবে এমন কাজ করা যাতে বুঝা যায়, ঐ সব বিষয়ে আল্লাহর সঙ্গে অন্যের অংশীদারিত্ব স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।

বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হল শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ হবে না কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ হবে কুরআন, হাদীস ও Common sense এর তথ্যের মাধ্যমে এটি পর্যালোচনা করা। অত:পর এ পর্যালোচনায় যে তথ্য বেরিয়ে আসবে তা জাতিকে জানানো। আর এর মাধ্যমে জাতিকে দুনিয়া ও আখিরাতের অপরিসীম অকল্যাণ থেকে উদ্ধার করে সফলতার দিকে ব্যাপকভাবে অগ্রসর করে দেয়া।

সবচেয়ে বড় গুনাহর বিষয়ে Common sense এর তথ্য (উদাহরণ)

একজন ডাক্তার হলো সেই ব্যক্তি যিনি ডাক্তারী প্রাকটিস করেন। এখন কোন মানুষকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, নিম্নের বিষয়গুলোর মধ্যে একজন ডাক্তারের জন্য সবচেয়ে বড় অপরাধ (গুনাহ) কোনটি হবে?-

১. টাইফয়েড রোগের চিকিৎসায় ভুল করা

২. এপিন্ডিসাইটিস অপারেশনে ভুল করা

৩. হার্টের কোন রোগের চিকিৎসায় ভুল করা

৪. পিত্ত পাথরের অপারেশনে ভুল করা
৫. অন্যকোন যে কোন একটি রোগের চিকিৎসায় ভুল করা
৬. সবচেয়ে নির্ভুল গ্রন্থ অধ্যয়ন করে ডাক্তারী বিদ্যার জ্ঞান অর্জন না করে ডাক্তারী প্রাকটিস করা,

পৃথিবীর Common sense জাগ্রত থাকা সকল মানুষ একবাক্যে উত্তর দিবেন যে, একজন ডাক্তারের সবচেয়ে বড় অপরাধ (গুনাহ) হবে ৬ নং ধারার বিষয়টি। কারণ, সবচেয়ে নির্ভুল গ্রন্থ অধ্যয়ন করে ডাক্তারী বিদ্যার জ্ঞান যে ডাক্তার অর্জন করেছে চিকিৎসা করতে গিয়ে মানুষ হিসেবে দু- একটি ভুল তার অবশ্যই হতে পারে। কিন্তু যে ডাক্তার সবচেয়ে নির্ভুল গ্রন্থ অধ্যয়ন করে ডাক্তারী বিদ্যার জ্ঞান অর্জন করেনি সে চিকিৎসা করতে গেলে অনেক ভুল করবে। ফলে তার সব রুগী মারা যাবে বা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং তাকেও অপমানিত হতে হবে ও শাস্তি পেতে হবে।

মুসলিম হল সেই ব্যক্তি যিনি ইসলাম প্রাকটিস করেন। এবার যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, নিম্নের বিষয়গুলোর মধ্যে একজন মুসলিমের জন্য সবচেয়ে বড় গুনাহ (অপরাধ) কোনটি হবে?-

১. সালাত কায়েম না করা
২. সিয়াম পালন না করা
৩. ঘুষ খাওয়া
৪. জিহাদ না করা
৫. মানুষ হত্যা করা
৬. শিরক করা
৭. ইসলামের একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ কুরআনের জ্ঞান অর্জন না করে ইসলাম প্রাকটিস (পালন) করা
৮. অন্য যেকোন একটি গুনাহের কাজ করা

পৃথিবীর Common sense জাগ্রত থাকা সকল মুসলিম ও মানুষ একবাক্যে উত্তর দিবেন যে, একজন মুসলিমের জন্য সবচেয়ে বড় গুনাহ (অপরাধ) হবে ৭ নং ধারার বিষয়টি। কারণ, ইসলামের একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ কুরআন অধ্যয়ন করে জ্ঞান অর্জন করা মুসলিমের ইসলাম পালন (প্রাকটিস) করতে গিয়ে মানুষ

হিসেবে দু- একটি গুনাহ (ভুল) অবশ্যই হতে পারে। কিন্তু যে মুসলিম কুরআন অধ্যয়ন করে জ্ঞান অর্জন না করে ইসলাম পালন (প্রাকটিস) করবে সে শিরকসহ অনেক গুনাহ করে যেতেই থাকবে। আর এর ফলে সে নিজে যেমন ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হবে তেমনি সমাজেরও ব্যাপক ক্ষতি করবে। তাই, Common sense এর আলোকে সহজে বলা যায় যে, কুরআনের জ্ঞান না থাকা শিরক করার চেয়ে অনেক বড় গুনাহ হবে।

♣♣ জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামের দেয়া নীতিমালা হলো-

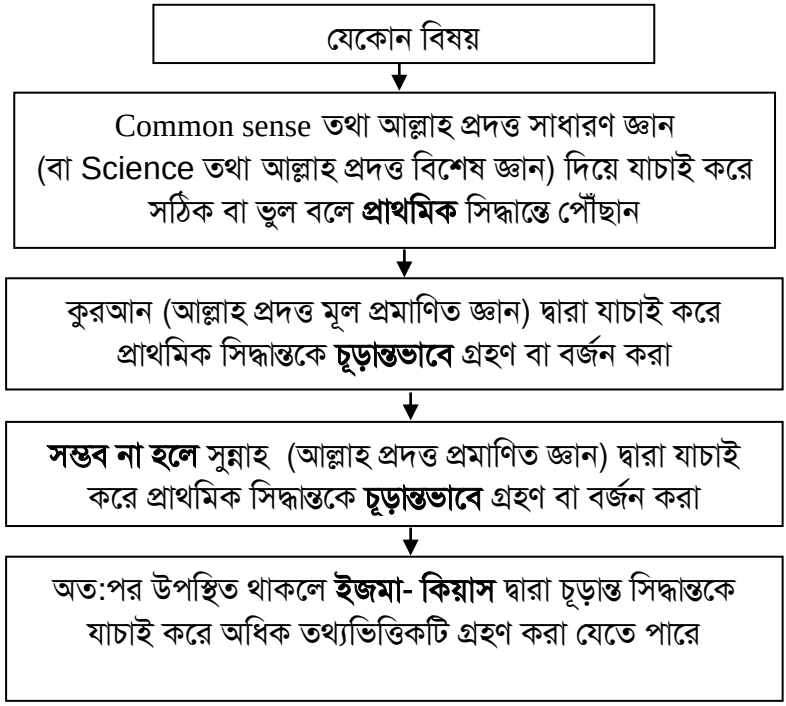

তাই, এ পর্যায়ে এসে আমরা বলতে পারি যে, পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হলো- কুরআনের জ্ঞান না থাকা শিরক করার চেয়ে অনেক বড় গুনাহ।

সবচেয়ে বড় গুনাহর বিষয়ে কুরআনের তথ্য

সবচেয়ে বড় গুনাহর বিষয়ে আল- কুরআনের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে কুরআন ব্যাখ্যার নীতিমালার দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সকলকে সামনে রাখতে হবে। বিষয় দুটি হলো-

১. আল- কুরআনে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য নেই। এটি আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতে,

২. কুরআনের মাধ্যমে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে ঐ বিষয়ে যত আয়াত আছে সেগুলোকে পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চুড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। আর ঐ পর্যালোচনার সময় একটি আয়াতের অর্থ বা ব্যাখা অন্য আয়াতের সম্পূরক হতে হবে। বিরোধী হলে চলবে না।

চলুন এখন এ দু'টি বিষয়কে বিশেষভাবে সামনে রেখে সবচেয়ে বড় গুনাহর বিষয়ে কুরআনের তথ্যগুলো পর্যালোচনা করা যাক।

তথ্য- ১

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ .

অর্থ: নিশ্চয়ই শিরক অতিবড় যুলুম।

(লোকমান/৩১: ১৩)

ব্যাখ্যা: শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ বলে যারা বিশ্বাস করেন তাদের প্রায় সকলে সূরা লোকমানের ১৩ নং আয়াতের এ অংশটুকুকে ঐ তথ্যের দলিল হিসেবে জানেন। তাই চলুন তাফসীরের নীতিমালা (উসূলে তাফসীর) অনুযায়ী এ আয়াতাংশ হতে ঐ তথ্য পাওয়া যায় কিনা তা একটু বিস্তারিতভাবে জানা যাক।

সূরা লোকমানের ১৩ নং আয়াতের সম্পূর্ণ বক্তব্য হলো-

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ .

অর্থ: আর (স্মরণ কর) যখন লোকমান উপদেশ দেয়ার সময় তার পুত্রকে বলেছিল হে পুত্র! আল্লাহর সাথে শরীক করো না; নিশ্চয়ই শিরক অতিবড় যুলুম (গুনাহ)।

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির দুটি দিক পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত-

প্রথমত: আয়াতখানির তথ্যটি আল্লাহর সরাসরি বলা তথ্য বা আদেশ নয়। তথ্যটি হলো লোকমান (আ:) কর্তৃক তার ছেলেকে দেয়া একটি উপদেশ।

দ্বিতীয়ত: মহান আল্লাহ এখানে শিরককে অতিবড় গুনাহ বলেছেন। সবচেয়ে বড় গুনাহ বলেননি। আর عَظِيمٌ শব্দটি অতিবড় বুঝাতে ব্যবহার হওয়ার কুরআনের অন্য অনেক উদাহরণের দু'টি হলো-

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا ق وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ . وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا ق سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيم .

অর্থ: (ভেবে দেখ সে বিষয়টি) যখন তোমরা মুখে মুখে সেই কথাকে বহন করছিলে এবং নিজেদের জিহ্বা দ্বারা এমন কথা বলে বেড়াচ্ছিলে যার (সত্য হওয়ার প্রমাণিত) জ্ঞান তোমাদের ছিল না। তোমরা ওটাকে সাধারণ কথা মনে করছিলে। অথচ আল্লাহর নিকট তা একটি **অতিবড় (عَظِيمٌ)** বিষয় ছিল। ঐ কথা শুনেই তোমরা কেন বললে না, 'এ ধরনের কথা মুখে মুখে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়। ত্রুটি মুক্ত থাকা শুধু তোমার গুণ হে আল্লাহ। এটিতো **অতিবড় (عَظِيمٌ)** মিথ্যা দোষারোপ'।

(নূর / ২৪ : ১৫- ১৬)

তাই এ আয়াতাংশ (লোকমান/৩১: ১৩) থেকে শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ অথবা শিরককারী ব্যক্তি সবচেয়ে বড় গুনাহগার ব্যক্তি বলে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর কোন সুযোগ নেই। কিন্তু অবাক কান্ড হলো অধিকাংশ মুসলমান এ আয়াতাংশের বক্তব্যকেই শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ হওয়ার দলিল হিসেবে জানে। শয়তানের ধোঁকাবাজি কত মারাত্মক তা এ আয়াতাংশ থেকেও বুঝা যায়।

এখন চলুন, সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি এ তথ্য মহান আল্লাহ আল- কুরআনের যে সকল স্থানে জানিয়েছেন তার কয়েকটি জানা যাক-

তথ্য- ২

সূরা লোকমানের ১৩ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা যুলুম (ظلم) শব্দটির সাথে আজিম (عظيم) শব্দ জুড়ে দিয়ে শিরকের গুনাহর বড়ত্বের মাত্রা (অতিবড়) জানিয়ে দিয়েছেন। ঐ যুলুম (ظلم) শব্দের সর্বোচ্চ মান (Superlative degree) (اسم

(تفضيل) হলো আযলামু (اظلم)। এই আযলামু (اظلم) শব্দটি কুরআনের ১৬টি স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে। ঐ ১৬টি স্থানের বক্তব্য হলো-

স্থান- ১

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ

অর্থ: তাহলে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে যে জ্ঞান না থাকার কারণে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করার জন্য।

(আন'আম/৬ : ১৪৪)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করার অর্থ হলো কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা। অন্যদিকে ইসলামে কুরআনের বিপরীত সকল কথাই মিথ্যা। তাই সে কথা কুরআনের জ্ঞান না থাকার কারণে ভুল করে বলা হোকে বা কুরআনের জ্ঞান না থাকার পর ইচ্ছা করে বলা হোক।

এ আয়াতের সরাসরি বক্তব্য হলো কুরআনের জ্ঞান না থাকার দরুণ কুরআন সম্পর্কে ভুল কথা রচনা করা ব্যক্তি 'সবচেয়ে বড় যালিম'। আবার আয়াতখানিতে সরাসরিভাবে 'মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যাওয়াকে' ঐ ব্যক্তির 'সবচেয়ে বড় যালিম' হিসেবে গণ্য হওয়ার কারণ বলা হয়েছে।

স্থান- ২

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۚ

অর্থ: আর তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহ (কুরআন) সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে অথবা সত্য (কুরআন) সম্পর্কে মিথ্যা বলে যখন তা (তার নিকট) পৌঁছে গেছে?

(আনকাবুত/২৯ : ৬৮)

ব্যাখ্যা: কুরাআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা যেতে পারে কুরআনের জ্ঞান না থাকার কারণে ভুল করে বা কুরআনের জ্ঞান থাকার পর ইচ্ছা করে। আর কুরআনের আয়াত নিজের নিকট পৌঁছার পর তাকে মিথ্যা বলার অর্থ হলো কুরআনের জ্ঞান থাকার পর কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা বলা। তাই এখানে কুরআনের জ্ঞান থাকা বা না থাকা কোন অবস্থার কথা উল্লেখ না করে কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা ব্যক্তি এবং কুরআনের জ্ঞান থাকার পর কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা বলা

ব্যক্তিকে 'সবচেয়ে বড় যালিম' বলা হয়েছে। তবে কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা ব্যক্তির কথা প্রথমে এবং কুরআনের জ্ঞান থাকার পর কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা বলা ব্যক্তির কথা পরে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ দু'ধরণের ব্যক্তি কেন 'সবচেয়ে বড় যালিম' হিসেবে গণ্য হবে তা এখানে সরাসরিভাবে বলা হয়নি। কিন্তু সহজে বুঝা যায়, কুরআনের জ্ঞান না থাকা বা থাকা উভয় অবস্থায় কুরআন সম্পর্কে ভুল রচনা করা বা বলা, ভুল বা মিথ্যা কথা মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যায়। তাই মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যাওয়াই হলো এ দু'ধরণের ব্যক্তিদের 'সবচেয়ে বড় যালিম' হিসেবে গণ্য হওয়ার কারণ। স্থান- ১ এর আয়াতখানিতে কুরআনের জ্ঞান না থাকার কারণে যারা কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে তাদের সম্বন্ধে এ কথাটি সরাসরিভাবে বলা হয়েছে।

স্থান- ৩

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۚ

অর্থ: তাহলে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহ সম্পর্কে (কুরআন সম্পর্কে) মিথ্যা বলে এবং সত্য সম্পর্কে (কুরআন সম্পর্কে) মিথ্যা বলে যখন তা (তার নিকট) পৌঁছে গেছে?

(যুমার/৩৯ : ৩২)

ব্যাখ্যা: দ্বিতীয় অবস্থাটি হলো কুরআনের জ্ঞান থাকা অবস্থা। তাহলে প্রথম অবস্থাটি হবে কুরআনের জ্ঞান না থাকা অবস্থা। তাই এখানে কুরআনের জ্ঞান না থাকা এবং জ্ঞান থাকা উভয় অবস্থায় কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা বলা ব্যক্তিকে সবচেয়ে বড় যালিম বলা হয়েছে। তবে জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিদের কথা প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে।

স্থান- ৪

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ

অর্থ: আর তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহ সম্পর্কে (কুরআন সম্পর্কে) মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর আয়াতকে (কুরআনের আয়াতকে) মিথ্যা বলে?

(আন'আম/৬ : ২১)

ব্যাখ্যা: এখানে কুরআনের জ্ঞান না থাকা বা থাকা কোন অবস্থার কথা উল্লেখ না করে কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা এবং কুরআনের আয়াতকে মিথ্যা বলা ব্যক্তিদের 'সবচেয়ে বড় যালিম' বলা হয়েছে। আর এখানেও 'কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা' কথাটি আগে এবং 'কুরআনের আয়াতকে মিথ্যা বলা' কথাটি পরে উল্লেখ করা হয়েছে।

স্থান- ৫

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ

অর্থ: তাহলে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর আয়াতকে মিথ্যা বলে?

(আ'রাফ/৭:৩৭)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতখানির বক্তব্য ৩নং স্থানের আয়াতখানির বক্তব্যের অনুরুপ।

স্থান- ৬

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ

অর্থ: তাহলে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর আয়াতকে মিথ্যা বলে?

(ইউনুস/১০ : ১৭)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতখানির বক্তব্যও ৩নং স্থানের আয়াতখানির বক্তব্যের অনুরুপ।

স্থান- ৭

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ

অর্থ: আর তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহ সম্পর্কে (কুরআন সম্পর্কে) মিথ্যা রচনা করে?

(হুদ/১১ : ১৮)

ব্যাখ্যা: এখানে শুধুমাত্র কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা ব্যক্তিকে 'সবচেয়ে বড় যালিম' বলা হয়েছে। তবে কুরআনের জ্ঞান না থাকা বা থাকা কোন অবস্থায়

ঐ ধরণের আচরণ করা ব্যক্তি 'সবচেয়ে বড় যালিম' হিসেবে গণ্য হবে তা সরাসরিভাবে বলা হয়নি।

স্থান- ৮

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا.

অর্থ: তাহলে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহ সম্পর্কে (কুরআন সম্পর্কে) মিথ্যা রচনা করে?

(কাহাফ/১৮ : ১৫)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতখানির বক্তব্য ৬নং স্থানের আয়াতখানির বক্তব্যের অনুরুপ।

স্থান- ৯

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ

অর্থ: আর তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহ সম্পর্কে (কুরআন সম্পর্কে) মিথ্যা রচনা করে অথবা বলে- আমার নিকট ওহী অবতীর্ণ হয় অথচ তার প্রতি কোন ওহী অবতীর্ণ করা হয়নি এবং যে বলে- আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন আমিও তার অনুরুপ অবতীর্ণ করব?

(আন'আম/৬ : ৯৩)

ব্যাখ্যা: এখানেও কুরআনের জ্ঞান থাকা বা না থাকা কোন অবস্থার কথা উল্লেখ না করে কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা ব্যক্তিকে 'সবচেয়ে বড় যালিম' বলা হয়েছে।

স্থান- ১০

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ ۚ

অর্থ: আর তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহ সম্পর্কে (কুরআন সম্পর্কে) মিথ্যা রচনা করে অথচ তাকে ডাকা হচ্ছে ইসলামের দিকে?

(আস্- সাফ/৬১ : ৭)

ব্যাখ্যা: এখানেও কুরআনের জ্ঞান থাকা বা না থাকা কোন অবস্থার কথা উল্লেখ না করে কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা ব্যক্তিকে 'সবচেয়ে বড় যালিম' বলা হয়েছে।

স্থান- ১১

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ

অর্থ: তাহলে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহর আয়াতকে (কুরআনের আয়াতকে) মিথ্যা বলে এবং তা (আয়াতের বক্তব্য) থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে?

(আন'আম/৬: ১৫৭)

ব্যাখ্যা: এখানে কুরআনের জ্ঞান না থাকা বা থাকা কোন অবস্থার কথা উল্লেখ না করে কুরআনের আয়াতকে মিথ্যা বলা এবং আয়াতের বক্তব্য থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা ব্যক্তিকে 'সবচেয়ে বড় যালিম' বলা হয়েছে।

স্থান- ১২

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا

অর্থ: আর তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে যাকে তার রবের আয়াত (কুরআনের আয়াত) স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় অত:পর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়?

(সাজদা/৩২ : ২২)

ব্যাখ্যা: কুরআনের আয়াত স্মরণ করিয়ে দেয়া ব্যক্তির কুরআনের জ্ঞান আছে। তাই এখানে কুরআনের জ্ঞান থাকার পর কুরআনের আয়াতকে মিথ্যা বলা এবং আয়াতের বক্তব্য থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা ব্যক্তিকে 'সবচেয়ে বড় যালিম' বলা হয়েছে।

স্থান- ১৩

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ۚ

অর্থ: আর তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে যাকে তার রবের আয়াত (কুরআনের আয়াত) স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায়?

(কাহাফ/১৮ : ৫৭)

ব্যাখ্যা: এখানেও কুরআনের জ্ঞান থাকার পর আয়াতের বক্তব্য থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা ব্যক্তিকে 'সবচেয়ে বড় যালিম' বলা হয়েছে।

স্থান- ১৪

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ۗ

অর্থ: তার চেয়ে বড় যুলুমকারী আর কে হতে পারে যার নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে কোন সাক্ষ্য বর্তমান আছে কিন্তু সে তা গোপন করে।

(বাকারা /২ : ১৪০)

ব্যাখ্যা: আল্লাহর পক্ষ হতে কোন সাক্ষ্য বর্তমান থাকার পর তা গোপন করার অর্থ হলো কুরআনের তথ্য জানা থাকা কিন্তু মানুষকে তা না জানানো। তাই এখানে কুরআনের জ্ঞান থাকার পর তা মানুষকে না জানানো ব্যক্তিকে 'সবচেয়ে বড় যালিম' বলা হয়েছে। কুরআনের তথ্য না জানতে পারলে মানুষ ভুল পথে চলে যাবে। তাই কুরআনের তথ্য জানার পর তা গোপন করার অর্থ হলো কুরআনের জ্ঞান থাকার পর মানুষকে ভুল পথে চলে যেতে সহায়তা করা। তাই ফলাফলের দিক থেকে এ কাজটি কুরআনের জ্ঞান থাকার পর কুরআন সম্পর্কে ভুল রচনা করা বা মিথ্যা বলার সমতুল্য কাজ।

স্থান- ১৫

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ

অর্থ: আর তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহর মসজিদে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় এবং সেগুলো ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালায়।

(বাকারা/২ : ১১৪)

ব্যাখ্যা: মসজিদের প্রধান কাজ হলো সালাত আদায় করা। আর সালাতের প্রধান বিষয় হলো পুন: পুন: তেলাওয়াত করার (রিভিশন দেয়া) মাধ্যমে কুরআনের বক্তব্যকে স্মরণ রাখার ব্যাবস্থা করা এবং বাস্তবে পালন করার মাধ্যমে (Practical training) কুরআনের বিধানগুলোর বাস্তব প্রয়োগ শিখানো। তাই মসজিদে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয়া এবং সেগুলো ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালানোর প্রধান অর্থ হলো কুরআনের জ্ঞান থেকে দুরে সরানোর চেষ্টার মাধ্যমে মানুষকে ভুল পথে চলে যেতে সহায়তা করা। তাই ফলাফলের দিক

থেকে এ কাজটিও কুরআনের জ্ঞান থাকার পর কুরআন সম্পর্কে ভুল রচনা করা বা মিথ্যা বলার সমতুল্য কাজ।

স্থান- ১৬

وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ.

অর্থ: আর তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কেও (ধ্বংস করেছি); তারা ছিল আরো বড় যালিম ও অবাধ্য।

(নজম/৫৩ : ৫২)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আযলামু (اظلم) শব্দটি দ্বারা অন্য অনেক নবীর সম্প্রদায়ের তুলনায় নূহ (আ:) এর সম্প্রদায় অধিকতর বড় যালিম ছিল- এটি বুঝানো হয়েছে।

সম্মিলিত শিক্ষা: উপরোক্ত ১৬ টি অবস্থানে থাকা ১৬ খানি আয়াত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১টি স্থানে আযলামু (اظلم) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে অনেক নবীর সম্প্রদায়ের তুলনায় নূহ (আ:) এর সম্প্রদায় অধিকতর বড় যালিম ছিল- এ কথাটি জানানোর জন্য। বাকি ১৫টি স্থানে আযলামু (اظلم) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে 'সবচেয়ে বড় যালিম' কে তা জানানোর জন্য। ঐ ১৫টি স্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সেখানে কুরআন সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা বা থাকা উভয় অবস্থায় কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা ব্যক্তিদের অথবা কুরআন সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা বা থাকা উভয় অবস্থায় কুরআনের আয়াতকে মিথ্যা বলা ব্যক্তিদের 'সবচেয়ে বড় যালিম' বলা হয়েছে। আর এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে তারা মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যায়। এখন প্রশ্ন হলো কুরআনের জ্ঞান না থাকা অবস্হায় কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা বা আয়াতকে মিথ্যা বলা ব্যক্তিরা অধিকতর বড় যালিম বলে গণ্য হবে না কুরআনের জ্ঞান থাকা অবস্হায় কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা বা আয়াতকে মিথ্যা বলা ব্যক্তিরা অধিকতর বড় যালিম বলে গণ্য হবে?

অধিকতর বড় যালিম কে হবে সে বিষয়ে Common sense

Common sense এর রায় হলো-

১. যে ব্যক্তি কুরআন জানার পর ভুল বলে মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যায় তার জানার ফরজটি আদায় হয় কিন্তু ভুল বলার মাধ্যমে মানুষকে ভুল পথে নিয়ে

যাওয়ার জন্য গুনাহ হয়। অর্থাৎ তার একটি গুনাহ হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি কুরআন না জানার কারণে ভুল বলে মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যায় তার কুরআন না জানার জন্য একটি গুনাহ হয় এবং মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য আর একটি গুনাহ হয়। অর্থাৎ তার দুটি গুনাহ হয়।

২. যে ব্যক্তি কুরআন জানে তার ভবিষ্যতে একদিন সঠিক কথাটি বলা এবং সে অনুযায়ী আমল করার সম্ভাবনা থাকে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে কথা ও কাজের মাধ্যমে তারা মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যাওয়ার গুনাহ এবং নিজের ভুল কাজ কারার গুনাহ থেকে মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যে কুরআন জানে না সে সারা জীবন শিরকসহ নানা বিষয়ে ভুল বলে মানুষকে শিরক ও নানা ধরণের কবীরা গুনাহে লিপ্ত করাবে এবং নিজেও সারাজীবন শিরকসহ নানা ধরণের গুনাহ করবে।

৩. না জানার কারণে কুরআন সম্পর্কে ভুল বলা থেকে জানার পর কুরআন সম্পর্কে ভুল বলা অধিক গুনাহ কথাটি মানুষকে কুরআনের জ্ঞান অর্জন থেকে দূরে সরায়। আর না জানার কারণে কুরআন সম্পর্কে ভুল বলা থেকে জানার পর কুরআন সম্পর্কে ভুল বলা অধিক গুনাহ তথ্যটি মানুষকে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে বাধ্য করে।

তাই Common sense অনুযায়ী সহজে বলা যায় যে, কুরআন না জানার কারণে কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা বা আয়াতকে মিথ্যা বলা ব্যক্তি কুরআন জানার পর কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা বা আয়াতকে মিথ্যা বলা ব্যক্তির চেয়ে অধিকতর বড় যালিম। আর যেহেতু তাদের 'সবচেয়ে বড় যালিম' হিসেবে গণ্য হওয়ার কারণ হলো কুরআনের জ্ঞান না থাকা সেহেতু কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় যুলুম বা গুনাহ।

অধিকতর বড় যালিম কে হবে সে বিষয়ে আল- কুরআন

তথ্য- ক

উপরে বর্ণিত যে ১৫টি স্থানে কুরআন 'সবচেয়ে বড় যালিম' সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থাপন করেছে তা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়-

- ১ম স্থানের আয়াতখানিতে জ্ঞান না থাকার কারণে কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা ব্যক্তিকে 'সবচেয়ে বড় যালিম' বলা হয়েছে।
- ৩টি স্থানে (১২, ১৩ ও ১৪ নং স্থান) জ্ঞান থাকার পর কুরআনের আয়াতকে মিথ্যা বলা ব্যক্তিকে 'সবচেয়ে বড় যালিম' বলা হয়েছে।
- যে সকল স্থানে (অবস্থান ২ ও ৩) জ্ঞান না থাকার কারণে বা জ্ঞান থাকার পর কুরআনের আয়াতকে মিথ্যা বলা কথা দু'টি একসাথে এসেছে তার সবখানে 'জ্ঞান না থাকার কারণে কুরআনের আয়াতকে মিথ্যা বলা' কথাটি প্রথমে উল্লেখ করা হয়ছে।
- যে সকল স্থানে (অবস্থান ৪, ৫ ও ৬) 'কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা' এবং 'কুরআনের আয়াতকে মিথ্যা বলা' এ উভয় অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার সবখানে 'কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা' কথাটি আগে এবং 'কুরআনের আয়াতকে মিথ্যা বলা' কথাটি পরে উল্লেখ করা হয়ছে। প্রথম স্থানের আয়াতখানিতে 'কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা' কথাটিকে কুরআনের জ্ঞান না থাকা অবস্থার সাথে সরাসরিভাবে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে।
- ১ম স্থানের আয়াতখানি বাদে অন্য যে সকল স্থানে (অবস্থান ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ ও ১৫) 'কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা' বা 'কুরআনের আয়াতকে মিথ্যা বলা' কথা দু'টির যেকোন একটি এসেছে সেখানে কুরআনের জ্ঞান না থাকা বা থাকা কোন কথা উল্লেখ করা হয়নি।

তাই আল- কুরআনের এ ১৫টি স্থানের বক্তব্য পর্যালোচনা করলে বলা যায় যে, কুরআন অনুযায়ী, কুরআন না জানার কারণে কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা বা কুরআনের আয়াতকে মিথ্যা বলা ব্যক্তি কুরআন জানার পর কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা বা আয়াতকে মিথ্যা বলা ব্যক্তির চেয়ে অধিকতর বড় যালিম।

তথ্য- খ

পরে আসা আল- কুরআনের তথ্যগুলোয় থাকা আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কুরআনের জ্ঞান থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ।

♥♥ তাই নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, আল- কুরআনের এ ১৫টি স্থানের বক্তব্যের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, কুরআনের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তি কুরআনের জ্ঞান থাকা ব্যক্তির চেয়ে অধিক বড় যালিম। অর্থাৎ কুরআনের জ্ঞান না থাকা 'সবচেয়ে বড় গুনাহ'।

তথ্য- ৩.১

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ . الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

অর্থ: পড় তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি আলাক থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। পড় এবং তোমার রব বড় অনুগ্রহশীল। যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান (অর্জন পদ্ধতি) শিখিয়েছেন। মানুষকে এমন বিষয় শিখিয়েছেন যা সে জানত না।

(আলাক/৯৬ : ১- ৫)

তথ্য- ৩.২

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ

অর্থ: রমযান (হলো সে) মাস যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে; (কুরআন) মানব জাতির জন্য পথনির্দেশিকা ও স্পষ্ট তথ্যধারণকারী পথনির্দেশিকা এবং সত্য- মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী।

(বাকারা/২ : ১৮৫)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা: তথ্য ৩.১ এর পাঁচখানি আয়াত রাসূল (সা:) এর উপর প্রথম নাযিল হয়। এরপর বেশ কয়েক মাস (কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী কমপক্ষে ছয় মাস) কুরআনের কোন আয়াত নাযিল হয় নাই। আর ঐ লম্বা সময় কুরআন

নাযিল বন্ধ থাকায় রাসূল (সা:), তাঁকে রাসূল হিসেবে বাদ দেয়া হয়েছে মনে করে অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন।

তাহলে আল- কুরআনের নাযিল হওয়া প্রথম শব্দটি হলো 'পড়'। অর্থাৎ 'জ্ঞান অর্জন কর'। এটি একটি আদেশমূলক কথা। তাই আল- কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহর দেয়া প্রথম আদেশ হলো জ্ঞান অর্জন করার আদেশ। এখানে অন্য যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হলো- আয়াত পাঁচখানিতে জ্ঞান ও জ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয় ছাড়া আর কোন বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

তথ্য ৩.২ আয়াতাংশের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কুরআন হল সত্যমিথ্যার পার্থক্যকারী। অর্থাৎ কুরআনের বক্তব্য সত্য (নির্ভুল) এবং কুরআনের বিপরীত বক্তব্য বা তথ্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকাহ, ফাজায়েলে আমল, বিজ্ঞান অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি যাই হোক না কেন।
কোন বিষয়ের জ্ঞান অর্জনের চিরসত্য নিয়ম হল ঐ বিষয়ের সর্বাধিক নির্ভুল গ্রন্থটির জ্ঞান প্রথমে অর্জন করা। তাই সহজেই বলা যায় যে, জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করতে হলে সর্বপ্রথম কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে।
তাই এ দুটি তথ্যের বক্তব্য মিলালে যা জানা যায় তা হলো- আল- কুরআনের প্রথম নির্দেশ হচ্ছে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করার নির্দেশ। বুঝা মোটেই কঠিন নয় যে, কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তথা সবচেয়ে বড় ফরজ এবং কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ বলে আল্লাহ তাঁর প্রথম নির্দেশ হিসেবে এ কথাটিকে বেছে নিয়েছেন।

'শিরক করো না' কথাটি প্রথম নির্দেশ হিসেবে না জানানো, 'পড়' কথাটি প্রথম নির্দেশ হিসেবে জানানো এবং কুরআনের প্রথম পাঁচখানি আয়াতে শুধু জ্ঞান অর্জন সম্পর্কিত কথা উল্লেখ করা কিন্তু শিরক সম্বন্ধে কোন কথা উল্লেখ না করার মাধ্যমেও আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, কুরআনের জ্ঞান না থাকা শিরকের চেয়ে অনেক অনেক বড় গুনাহ।

তথ্য- ৪

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ .

অর্থ: যখন তোমরা কুরআন পড়বে (পড়া আরম্ভ করবে) তখন অভিশপ্ত শয়তান (শয়তানের ধোঁকাবাজি) থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে।

(নাহল/১৬ : ৯৮)

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ সালাত, সিয়াম বা অন্য কোন কাজ শুরু করার আগে শয়তানের ধোঁকাবাজি থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় চাইতে উপদেশও দেননি। কিন্তু এ আয়াতের মাধ্যমে তিনি কুরআন পড়া শুরু করার সময় শয়তানের ধোঁকাবাজি থেকে তাঁর নিকট সাহায্য চাইতে আদেশ দিয়েছেন। তাই জানার পরও কেউ যদি কুরআন পড়া আরম্ভ করার আগে আউজুবিল্লাহ না পড়ে তবে তার আল্লাহর আদেশ অমান্য করার গুনাহ তথা কবীরা গুনাহ হবে।

আল্লাহ তাঁর এ কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন সালাত, সিয়াম ইত্যাদি আমল থেকে দূরে সরানো শয়তানের কাজ। তবে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে সরানো শয়তানের সবচেয়ে বড় কাজ। তাই আল্লাহ যদি সাহায্য না করেন তবে কুরআন পড়েও কেউ কুরআনের সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে পারবে না।

যেটি শয়তানের সবচেয়ে বড় কাজ সেটিই সবচেয়ে বড় গুনাহ। তাই মহান আল্লাহ এ আয়াতের মাধ্যমেও জানিয়ে দিয়েছেন, সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো কুরআনের জ্ঞান না থাকা।

তথ্য- ৫

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ

অর্থ: বল যারা জানে (জ্ঞানী) আর যারা জানে না (অজ্ঞ) তারা কি কখনও সমান হতে পারে?

(যুমার/৩৯ : ০৯)

ব্যাখ্যা:

যারা জ্ঞানী আর যারা অজ্ঞ তারা কি কখনও সমান হতে পারে?

↓

যারা জ্ঞানী আর যারা অজ্ঞ তারা কখনও সমান হতে পারে না।

↓

যারা কুরআনের জ্ঞানী আর যারা কুরআনের জ্ঞানী নয় তারা কখনও সমান হতে পারে না।

↓

যারা কুরআনের জ্ঞানী নয় তারা কুরআনের জ্ঞানীদের তুলনায়

তথ্য- ৬

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ .

অর্থ: বল অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি কখনও সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা- ভাবনা কর না?

(আন্'আম / ৬ : ৫০ এবং কুরআনের আরো অনেক স্থানে)

ব্যাখ্যা:

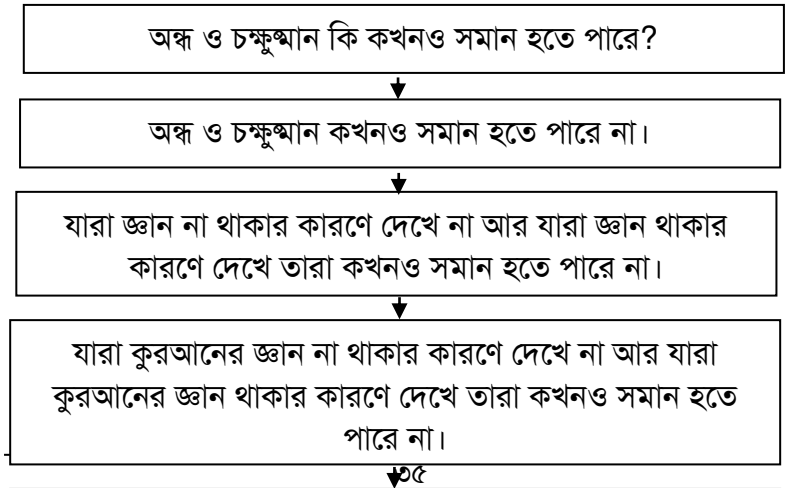

আয়াতের শেষে 'তোমরা কি চিন্তা- ভাবনা কর না?'- প্রশ্নটির মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে তিরষ্কার করেছেন। অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান কোন দিক দিয়ে সমান হতে পারে না বিষয়টি এবং এ তথ্যটি ব্যাখ্যা করে শিরক নয় বরং কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ বিষয়টি বুঝা অত্যন্ত সহজ। তাই আল্লাহ এখানে মানুষকে তিরষ্কার করেছেন এ কারণে যে, যে মানুষকে তিনি Common sense (আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান) দিয়ে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে তৈরী করেছেন সে মানুষ এত সহজ একটি বিষয় কেন বুঝতে পারবে না? অর্থাৎ বলা যায় শিরক নয় বরং কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ, এ বিষয়টি যারা বুঝতে বা মানতে পারবেনা তাদেরকে আল্লাহর তিরষ্কারের সম্মুখীন হতে হবে।

তথ্য- ৭

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে মাফ করেন না; আর উহা ভিন্ন (অন্য গুনাহ) যাকে ইচ্ছা মাফ করেন।

(নিসা/৪ : ৪৮)

অসতর্ক ব্যাখ্যা: যারা শিরককে সবচেয়ে বড় গুনাহ হিসেবে জানেন বা প্রচার করেন তাদের অনেকে শুধু এ আয়াতখানির অসতর্ক ব্যাখ্যাকে ঐ তথ্যের দলিল হিসেবে জানেন। আর অনেকে ১ নং তথ্যের আয়াতখানির সঙ্গে এ আয়াতখানিকেও দলিল হিসেবে জানেন।

এ আয়াতের দু'টি ব্যাখ্যা মুসলিম সমাজে চালু আছে-

১. আল্লাহ এখানে বলেছেন তাঁর সাথে শরীক করার গুনাহকে তিনি মাফ করেন না। আর শিরক ব্যতীত অন্য সকল গুনাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন। তাই এ আয়াত থেকে জানা যায় শিরক করা সবচেয়ে বড় গুনাহ।
২. অন্য আয়াতে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন তাওবার মাধ্যমে শিরকসহ সকল গুনাহ (মানুষের হক ফাঁকি দেয়ার গুনাহ বাদে) দুনিয়ায় মাফ হবে তাই এ আয়াতের প্রয়োগস্থল হবে পরকাল। অর্থাৎ পরকালে আল্লাহ শিরক ব্যতীত অন্য সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন।

আয়াতখানির চালু প্রথম ব্যাখ্যাটির কারণ হলো ' মাফ হওয়া না হওয়াকে গুনাহ বড় বা ছোট হওয়ার একমাত্র মাপকাঠি ধরা' এবং 'আল্লাহর ইচ্ছা' কথাটির সঠিক অর্থ বুঝতে না পারা। মাফ হওয়া না হওয়া যদি গুনাহ বড় বা ছোট হওয়ার একমাত্র মাপকাঠি হয় তবে মানুষের হক ফাঁকি দেয়ার গুনাহ শিরকের চেয়ে বড় গুনাহ হবে। কারণ, শিরক তাওবার মাধ্যমে মাফ হয় কিন্তু মানুষের হক ফাঁকি দেয়ার গুনাহ তাওবায় মাফ হবে না যদি হক আগে ফেরত দেয়া না হয়। 'আল্লাহর ইচ্ছা' কথাটির সঠিক অর্থ নিয়ে আলোচনা পরে আসছে।

আর আয়াতখানির চালু দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিও গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ আয়াতখানির প্রয়োগস্থল পরকাল হলে পুরো আয়াতের বক্তব্য পরকালের জন্য গ্রহণযোগ্য হতে হবে। আয়াতখানির প্রথম অংশের ব্যাখ্যা যদি এটি হয় যে, 'পরকালে আল্লাহ শুধু শিরকের গুনাহ মাফ করবেন না'। তবে আয়াতখানির দ্বিতীয় অংশের ব্যাখ্যা হবে, 'পরকালে আল্লাহ শিরক ভিন্ন সকল ধরণের কবীরা গুনাহ মাফ করে দিবেন'। এ তথ্য আল- কুরআনের অনেক আয়াত ও অনেক সহীহ হাদীসের সরাসরি বিরুদ্ধ। কারণ সেখানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বলা হয়েছে পরকালে কোন ধরণের কবীরা গুনাহ মাফ হবে না। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কী?' নামক বইটিতে।

আমরা এখন বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে জানার চেষ্টা করবো এ আয়াতে কারীমার প্রকৃতশিক্ষা কী। এ ব্যাখ্যার সময়ও মনে রাখতে হবে কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন এবং কুরআনে পরস্পরবিরোধী কোন কথা, বক্তব্য বা তথ্য নেই।

প্রকৃত ব্যাখ্যা:

ক. শিরকের গুনাহ মাফ হওয়া না হওয়া

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا . وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا .

অর্থ: অবশ্যই আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন, যারা জাহালত (অজ্ঞতা, ধোঁকা, লোভ- লালসা ইত্যাদি) এর কারণে গুনাহের কাজ করে বসে। অত:পর অনতিবিলম্বে তাওবা করে নেয়। এরাই হল সেসব লোক, যাদের আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞ ও অতীব বুদ্ধিমান। আর এমন লোকদের জন্যে কোন তাওবা (ক্ষমা) নেই, যারা (যে মু'মিনরা) অন্যায় কাজ করে যেতেই থাকে যতক্ষণ না মৃত্যু উপস্থিত হয়। তখন তারা বলে, আমি এখন তাওবা করছি। অনুরূপভাবে তাদের জন্যেও কোন তাওবা (ক্ষমা) নেই যারা মৃত্যু পর্যন্ত কাফির থেকে যায়। এদের জন্যে আমি কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

(নিসা / ৪: ১৭,১৮)

ব্যাখ্যা: এ আয়াত দুখানির মাধ্যমে মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, শিরকসহ সকল গুনাহ (মানুষের হক ফাঁকি দেয়ার গুনাহ বাদে) তাওবার মাধ্যমে মাফ হবে। তবে ঐ তাওবা, গুনাহ করার সঙ্গে সঙ্গে অথবা মৃত্যু আসার যুক্তিসংগত সময়ের পূর্বে করতে হবে। অর্থাৎ মৃত্যুর এতটুকু সময় পূর্বে তাওবা করতে হবে যখন ব্যক্তির গুনাহ করার শক্তি- সামর্থ আছে কিন্তু সে স্বেচ্ছায় গুনাহর কাজ করবে না।

وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا .وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا . وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا . إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا . وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا .وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا

يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا .يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

অর্থ: রহমান- এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খদের কথা হয়, তখন তারা বলে, সালাম এবং রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সেজদাবনত ও দন্ডায়মান হয়ে এবং বলে, হে আমার পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত ধ্বংস। বসবাস ও আবাসস্থল হিসেবে তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট জায়গা। আর তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না এবং কৃপণতাও করে না। তাদের অবস্থান হয় এ দুয়ের মধ্যবর্তী। আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না, আল্লাহ যার হত্যা অবৈধ করেছেন সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না, এবং ব্যভিচার করে না। যারা এ কাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কেয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তথায় (দোযখে) লাঞ্চিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। কিন্তু যারা তাওবা করে ঈমানের পথে ফিরে এসে সৎকর্ম করবে আল্লাহ তাদের গুনাহকে সওয়াবে পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

(ফুরকান /২৫ : ৬৩- ৭০)

ব্যাখ্যা: রহমানের বান্দা তথা মু'মিনদের লক্ষ্য করে মহান আল্লাহ আয়াতগুলোর বক্তব্য আরম্ভ করেছেন। আয়াতে কয়েকটি বড় নিষিদ্ধ কাজের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে 'আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত করা'। অর্থাৎ শিরক করা। আয়াতের শেষে আল্লাহ বলেছেন যারা আয়াতে উল্লিখিত নিষিদ্ধ কাজগুলো তথা শিরকসহ অন্য কবীরা গুনাহগুলো করার পর তাওবা করে, তাদের ঐ সকল গুনাহ শুধু মাফই করা হবে না ঐ গুনাহ সওয়াবে পরিবর্তন করে দেয়া হবে।

তাহলে কুরআনের এ দুটি তথ্য থেকে নিশ্চিৎভাবে জানা যায় যে, শিরকসহ সকল গুনাহ তাওবার মাধ্যমে মাফ হয়।

খ. শিরক করলে যে সকল ধরণের গুনাহ হতে পারে

ইসলামে একটি নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হবে কি হবে না এবং হলে কি ধরনের গুনাহ হবে তা নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের উপর। বিষয় ৩টি হল-

ক. ওজর, বাধ্য- বাধকতা বা কৈফিয়ত

খ. অনুশোচনা
গ. উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা

তাই একটি বড় নিষিদ্ধ কাজ করলে ইসলামে পাঁচ ধরনের অবস্থা বা গুনাহ হতে পারে। যথা-

১. কোন গুনাহ হবে না ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা নিষিদ্ধ কাজটির সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের হলে এ ধরনের অবস্থা হবে।
২. ছগীরা গুনাহ হবে ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা নিষিদ্ধ কাজটির প্রায় সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের হলে এ ধরনের গুনাহ হবে।
৩. না ছগীরা না কবীরা (মধ্যম) গুনাহ ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা নিষিদ্ধ কাজটির গুরুত্ব বা পরিমাণের ৫০% (মাঝামাঝি) হলে এ ধরনের গুনাহ হবে।
৪. সাধারণ কবীরা গুনাহ ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা নিষিদ্ধ কাজটির গুরুত্ব বা পরিমাণের তুলনায় প্রায় না থাকার মত হলে এ ধরনের গুনাহ হবে।
৫. কুফরী কবীরা গুনাহ ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা মোটেই না থাকলে তথা খুশী মনে করলে এ ধরনের গুনাহ হবে।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন, হাদীস ও Common sense অনুযায়ী গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ' নামক বইটিতে।

তাই, ইসলামে শিরক করলে গুনাহ হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে পাঁচটি অবস্থান হতে পারে। যথা-

১. কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ
২. সাধারণ কবীরা গুনাহ
৩. না কবীরা না ছগীরা ধরনের গুনাহ
৪. ছগীরা গুনাহ
৫. কোন গুনাহ নয়

গ. ইসলামে গুনাহ মাফ হওয়ার উপায়সমূহ

ইসলামে গুনাহ মাফ হওয়ার উপায়সমূহ হলো-

১. তাওবা
২. নেক আমল
৩. অন্যের দোয়া
৪. শাফায়াত

অন্যদিকে আল্লাহর জানিয়ে দেয়া বিধান অনুযায়ী -

- তাওবার মাধ্যমে সকল ধরনের গুনাহ মাফ হয়
- কবীরা গুনাহ তাওবা ভিন্ন অন্যকোন উপায়ে মাফ হয় না
- শাফায়াতের মাধ্যমে মধ্যম ও ছগীরা গুনাহ মাফ হয়
- নেক আমলের মাধ্যমে শুধু ছগীরা গুনাহ মাফ হয়
- অন্যের দোয়ায় কবীরা গুনাহ মাফ হয় না।

বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন, হাদীস ও Common sense অনুযায়ী কবীরা গুনাহ সহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?' নামক বইটিতে।

ঘ. 'আল্লাহর ইচ্ছা' কথাটির অর্থ

আল- কুরআনের অনেক আয়াতে বলা হয়েছে 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন'। এ তথ্য থেকে অনেকে মনে করেন যে, গুনাহ মাফ হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টি আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এ ধরণের ব্যাখ্যা যে সঠিক নয় তা সাধারণ জ্ঞান- বুদ্ধির আলোকেও সহজে বুঝা যায়। কোন অপরাধের জন্য দেয়া শাস্তি ন্যায় বিচার হতে হলে সে শাস্তির বিষয়টি তথা আইনটি অপরাধ সংঘটনের আগে তৈরী হতে হবে এবং তা জানিয়ে দিতে হবে। পৃথিবীর সকল দেশের বিধান এটি। মহান আল্লাহ সর্বাধিক ন্যায় বিচারক সত্তা। তাই আল্লাহর এ বিধান অমান্য করার কথা নয় এবং তিনি তা করেনও নাই। তাই, গুনাহ করার পর শাস্তি দিবেন কি দিবেন না, তা গুনাহর কাজটি সংঘটিত হওয়ার পর আল্লাহ তাৎক্ষণিকভাবে নির্ধারণ করেন, এ কথা সঠিক হতে পারে না।

আল- কুরআনের যে সকল আয়াতে 'আল্লাহর ইচ্ছায়' কিছু হওয়ার কথা বলা আছে সেগুলোর বক্তব্য পাশাপাশি রেখে ব্যাখ্যা করলে বুঝা যায় যে, অধিকাংশ স্থানে 'আল্লাহর ইচ্ছা' বলতে আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা বুঝানো হয়েছে। তাৎক্ষণিক ইচ্ছা বুঝানো হয়নি। কারো অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা প্রয়োগ করা হয় তার করা বিধি বিধান, নিয়ম- কানুন বা প্রোগ্রামের মাধ্যমে। অর্থাৎ কারো তৈরী করে রাখা বিধি- বিধান, নিয়ম- কানুন বা প্রোগ্রাম অনুযায়ী কোন কাজ সংঘটিত হলে কাজটি তার অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা অনুযায়ী সংঘটিত হয়েছে বলে ধরতে হবে বা ধরা যায়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে- 'কুরআন, হাদীস ও

Common sense অনুযায়ী আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা' নামক বইটিতে।

♣♣ উল্লিখিত তথ্যসমূহ সামনে রেখে চলুন সূরা নিসার ৪৮ নং আয়াতখানির সঠিক ব্যাখ্যাটি জেনে নেয়া যাক। আয়াতখানির দুটি অংশ আছে। প্রথম অংশের বক্তব্য হলো- নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করাকে মাফ করেন না। আর ২য় অংশের বক্তব্য হলো- আর উহা ভিন্ন (অন্য গুনাহ) যাকে ইচ্ছা মাফ করেন।

প্রথম অংশের ব্যাখ্যা:

এ অংশের ব্যাখ্যা যদি এটি করা হয় যে আল্লাহ শিরকের গুনাহ তথা শিরকের সাথে সম্পর্কযুক্ত কবীরা, মধ্যম বা ছগীরা কোন ধরনের গুনাহ মাফ করেন না তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ- সূরা নিসার ১৭ ও ১৮ নং এবং সূরা ফুরকানের ৭৩ ও ৭৪ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাওবার মাধ্যমে শিরকের গুনাহ শুধু মাফই হবে না ঐ গুনাহ সওয়াবে পরিবর্তীত হয়ে যাবে।

তাই আয়াতেকারীমার এ অংশের সঠিক ব্যাখ্যা হবে- আল্লাহ শিরকের সাথে সম্পর্কযুক্ত কবীরা গুনাহ তাওবা ব্যতীত মাফ করবেন না। আর এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণ হলো- এটি অন্য সকল আয়াতের বক্তব্যের সাথে সম্পূরক হয় এবং কোন আয়াতের বিপরীত হয় না।

দ্বিতীয় অংশের ব্যাখ্যা:

আয়াতের এ অংশের ব্যাখ্যা করে যদি এটি বলা হয় যে, 'শিরক ভিন্ন অন্য সকল ধরনের গুনাহ সংঘটিত হওয়ার পর আল্লাহ তাৎক্ষনিকভাব যাকে ইচ্ছা মাফ করে দিবেন এবং যাকে ইচ্ছা মাফ করবেন না' তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ-

১. এটি ন্যায় বিচারের বিপরীত
২. কুরআনের অনেক জায়গায় আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেছেন শিরক বা অন্য যে কোন নিষিদ্ধ কাজ করার মাধ্যমে অর্জিত হওয়া কবীরা গুনাহ', তাওবা ব্যতীত আল্লাহ মাফ করবেন না।

অন্যদিকে আয়াতেকারীমার এ অংশের ব্যাখ্যা যদি করা হয়- আল্লাহ শিরক করার মাধ্যমে অর্জিত হওয়া কবীরা গুনাহ ভিন্ন অন্য ধরনের গুনাহ (শিরক সম্পর্কিত না ছগীরা না কবীরা গুনাহ ও ছগীরা গুনাহ) তাঁর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা তাঁর জানিয়ে দেয়া বিধান অনুযায়ী নেক আমল, দোয়া বা শাফায়াতের

মাধ্যমে মাফ করে দিবেন, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ এ ব্যাখ্যা কোন আয়াতের বিরোধী নয়।

তাই ব্যাখ্যা সহকারে বললে সূরা নিসার ৪৮ নং আয়াতখানির প্রকৃত বক্তব্য হবে- নিশ্চয়ই আল্লাহ শিরক সম্পর্কিত কবীরা গুনাহ তাওবা ব্যতীত মাফ করেন না। আর শিরক সম্পর্কিত মধ্যম ও ছগীরা গুনাহ, তাঁর জানিয়ে দেয়া বিধান অনুযায়ী নেক আমল, দোয়া, শাফায়াত ইত্যাদির মাধ্যমে যে মাফ পাওয়ার যোগ্য হবে তাকে মাফ করে দেন বা দিবেন।

♥♥ আল- কুরআনের এ সকল তথ্য থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে-

১. শিরক অতিবড় গুনাহ

২. কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ

তাহলে দেখা যায় যে, পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে (Common sense এর রায়) কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী ঐ প্রাথমিক সিদ্ধান্তই হল আলোচ্য বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো- শিরক অতিবড় গুনাহ এবং কুরআনের জ্ঞান না থাকা সচেয়েচে বড় গুনাহ।

সবচেয়ে বড় গুনাহর বিষয়ে হাদীস

যে বিষয় কুরআনে আছে রাসূল (সা:) তা অবশ্যই বলেছেন বা ব্যাখ্যা করেছেন। তাই আলোচ্য বিষয়ে, Common sense ও কুরআনের মাধ্যমে পৌঁছানো চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস অবশ্যই আছে। আর তাই আলোচ্য বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য হাদীস যাচাইয়ের প্রয়োজন পড়ে না। তবুও জানার জন্য চলুন এখন এ রায়ের সমর্থনকারী হাদীসসমূহ দেখা যাক।

হাদীসের তথ্য পর্যালোচনার সময় মনে রাখতে হবে-

১. হাদীস হলো কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই কুরআনের বিপরীত কথা রাসূল (সা.) এর হাদীস হতে পারে না।
২. হাদীস থেকে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার সময় ঐ বিষয়ের সকল হাদীস পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে।
৩. কুরআনের তথ্যের সাথে সংগতিশীল হাদীস ঐ বিষয়ের সবচেয়ে শক্তিশালী হাদীস।

৪. শক্তিশালী হাদীস একই বিষয়ের অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও বিপরীত বক্তব্য সম্বলিত হাদীসকে রহিত করে।

তথ্য- ১

وَعَنْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) الْكَبَائِرَ اَوْ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوْقِ الْوَالِدَيْنِ وَاَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِالْكَبَائِرِ قَالَ قَوْلُ الزُّوْرِ اَوْ قَالَ شَاهَادَةُ الزُّوْرِ قَالَ شُعْبَةُ وَاَكْبَرُ ظَنِّى اَنَّه شَاهَادَةُ الزُّوْرِ .

অর্থ: উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু বকর (রা:) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (রা:) কে বলতে শুনেছি- রাসূলুল্লাহ (সা:) বড় গুনাহ (কবীরা গুনাহ) সম্বন্ধে আলোচনা করলেন অথবা তাঁকে বড় গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, অবৈধভাবে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং পিতা- মাতার নাফরমানী করা। (অত:পর তিনি বললেন), এখন কি আমি সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি তা তোমাদের বলবো? তিনি বলেন, তা হচ্ছে মিথ্যা বলা (প্রচার করা) অথবা (তিনি বলেছেন) মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। শো'বা বলেন, আমার প্রবল ধারণা, তিনি বলেছেন "মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া"

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: মুসলিম, হাদীস নং- ২৭১)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানিতে রাসূল (সা:) বড় গুনাহ কোনগুলো এবং সবচেয়ে বড় গুনাহ কি তা জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি শিরক করা, অবৈধভাবে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং পিতা- মাতার নাফরমানী করাকে বড় গুনাহ (কবীরা গুনাহ) বলেছেন। আর মিথ্যা প্রচার করা বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়াকে সবচেয়ে বড় গুনাহ বলেছেন। মিথ্যা প্রচারকে সবচেয়ে বড় গুনাহ বলার কারণ হলো মিথ্যা প্রচারে অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সাধারণ বিষয়ে মিথ্যা প্রচারের তুলনায় কুরআনের বিষয়ে মিথ্যা প্রচার মানব সমাজের জন্য অনেক বেশী ক্ষতিকর। কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো মানুষের জীবনের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামী বিধান মতে কুরআনের বিপরীত সকল কথাই মিথ্যা। সে কথা ভুল করে বলা হোক বা ইচ্ছা করে বলা হোক। যে ব্যক্তির কুরআনের জ্ঞান আছে তার পক্ষে

ভুলক্রমে কুরআনের বিপরীত দু-একটি কথা বলা অসম্ভব নয়। কিন্তু যার কুরআনের জ্ঞান নেই সে সারা জীবন, মনের অজান্তে, নিজ কথা ও কাজের মাধ্যমে, শিরক ও অন্য বিষয়ে কুরআনের বিপরীত অনেক কথা প্রচার করবে। আর এর মাধ্যমে সে মানব সমাজ ও নিজের ব্যাপক ক্ষতি করবে।

আবার হাদীসখানিতে রাসূল (সা:) বড় গুনাহ (কবীরা গুনাহ) হিসেবে শিরক করা, অবৈধভাবে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং পিতা-মাতার নাফরমানী করার নাম উল্লেখ করেছেন। তবে এ তিনটির মধ্যে শিরক করাকে তিনি প্রথমে উল্লেখ করেছেন। অন্য হাদীসেও তিনি এরকমটি করেছেন। তাই, এ তিনটি বড় গুনাহর মধ্যে শিরক অধিকতর বড় (অতিবড়) এ কথা বলা যেতে পারে।
তাই হাদীসখানির আলোকে জানা যায় যে-

- ❖ শিরক অতিবড় গুনাহ
- ❖ কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ।

তথ্য- ২

وَعَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) اَلَا اُنَبِّيُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَاءِرِ. قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ– قَالَ : اَلْاِشْرَاكُ بِاللهِ . وَعُقُوْقُ الْوَلِدَيْنِ" وَكَانَ مُتَّكِياً فَجَلَسَ . فَقَالَ : أَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ! فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى : لَيْلَةُ سَكَتَ .

অর্থ: আবু বকর (রা:) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা:) বললেন: সবচেয়ে বড় গুনাহ কি, আমি কি তোমাদের তা অবহিত করবো না? আমরা বললাম, হাঁ, হে রাসূল (সা:)। তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং মাতা-পিতাকে কষ্ট দেওয়া। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি এ কথাগুলো হেলান দেওয়া অবস্থায় বলছিলেন। অত:পর তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন: সাবধান! আর মিথ্যা কথা বলবে না (প্রচার করবে না)। তিনি এ কথা বারবার বলতে থাকলেন। এমনকি আমরা বললাম, আহ! তিনি যদি এখন চুপ করতেন!

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: বুখারী, হাদীস নং ২৫১০; মুসলিম, হাদীস নং ২৬৯)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানিতে রাসূল (সা:) তিনটি বিষয়কে সবচেয়ে বড় গুনাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বিষয় তিনটি হল- শিরক করা, মাতা পিতাকে কষ্ট দেয়া এবং মিথ্যা প্রচার করা। প্রথম দুটি বিষয় রাসূল (সা:) হেলান দেয়া অবস্থায় বলেন কিন্তু 'মিথ্যা কথা প্রচার করা' কথাটি বলার সময় তিনি সোজা হয়ো বসেন। আর কথাটি তিনি এতবার উচ্চারণ করেন যে সাহাবায়েকেরাম কামনা করছিলেন রাসূল (সা:) কথাটি বলা বন্ধ করুক। এ বর্ণনাভঙ্গি থেকে সহজে বুঝা যায় হাদীস খানিতে রাসূল (সা:) বিষয় তিনটির মধ্যে মিথ্যা প্রচার করাকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। অর্থাৎ মিথ্যা কথা প্রচার করাকে অন্য দুটির (শিরক করা, মাতা পিতাকে কষ্ট দেয়া) চেয়ে বড় গুনাহ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

তাই ১ নং তথ্যের হাদীসখানির ন্যায় এ হাদীসখানি ব্যাখ্যা করেও বলা যায় যে-

- ❖ শিরক অতিবড় গুনাহ
- ❖ কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ।

তথ্য- ৩

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (ص) فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مَنْ اَلْفِ عَابِدٍ.

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন, রাসূল (সা:) বলেছেন, একজন ফকিহ শয়তানের নিকট হাজারো আবেদ অপেক্ষা অধিক (ভয়ের কারণ)।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: ইবনে মাজাহ, হাদীস নং- ২২২; তিরমিযি)

ব্যাখ্যা: ফকিহ' হলেন সেই ব্যক্তি যিনি ইসলামের গভীর তথা সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। ইসলামের একমাত্র নির্ভুল ও পরিপূর্ণ গ্রন্থ হলো আল- কুরআন। তাই ইসলামের গভীর (সঠিক) জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি তিনিই হবেন যার কুরআনের গভীর জ্ঞান আছে। আর কুরআনের গভীর জ্ঞানী হতে হলে তার হাদীসের ভাল জ্ঞান এবং কুরআনে উল্লেখ থাকা সকল (বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, ভূগোল ইত্যাদি) বিষয়ের মৌলিক জ্ঞান থাকতে হবে।

তাহলে বলা যায় যে, এ হাদীসখানির মাধ্যমে রাসূল (সা:) জানিয়ে দিয়েছেন- কুরআনের সঠিক জ্ঞানের অধিকারী ইবাদাতকারী ব্যক্তিকে, কুরআনের জ্ঞান না

থাকা ইবাদাতকারী ব্যক্তির তুলনায় শয়তান অনেক বেশী ভয় পায়। কারণ, কুরআনের সঠিক জ্ঞান থাকা ব্যক্তিকে ধোঁকা দেয়া কঠিন।

যে ধরনের ব্যক্তিকে শয়তান সবচেয়ে বেশী ভয় পায় সে ধরনের ব্যাক্তি যেন তৈরী হতে না পারে সেটিই শয়তান সবচেয়ে বেশী চাইবে, এটি সহজবোধগম্য একটি কথা। তাই শয়তান সবচেয়ে বেশী চায় মানুষকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখতে।

যেটি শয়তান সবচেয়ে বেশি চায় সেটিই হবে সবচেয়ে বড় গুনাহ, এটি বুঝাও কঠিন নয়। তাই এ হাদীসখানির মাধ্যমেও রাসূল (সা:) জানিয়ে দিয়েছেন যে, কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ।

তথ্য- ৪

وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفّانَ (ر) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ (ص) خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَه‘

অর্থ: উসমান ইবনে আফ্ফান (রা:) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা:) বলেছেন- তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে তা শিখায়।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: বুখারী, হাদিস নং ৪৬৫৪)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানির মাধ্যমে রাসূল (সা:) জানিয়ে দিয়েছেন যে, যার কুরআনের জ্ঞান আছে এবং অপরকে তা শিখায় সে হচ্ছে সর্বোত্তম ব্যক্তি। অর্থাৎ সে সবচেয়ে বেশী সাওয়াবের অধিকারী ব্যক্তি। কারণ সে সঠিক আমল করতে পারবে। কুরআন অপরকে শিখাতে হলে প্রথমে নিজে কুরআন জানতে হবে। তাহলে এ হাদীস অনুয়ায়ী কুরআনের জ্ঞান থাকা সবচেয়ে বড় সাওয়াবের কাজ বা সবচেয়ে বড় ফরজ।

কুরআনের জ্ঞান থাকা সবচেয়ে বড় সাওয়াবের কাজ বা সবচেয়ে বড় ফরজ হলে কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ হবে এটাই স্বাভাবিক। আর এর কারণ হলো যার কুরআনের জ্ঞান নেই সে শিরকসহ অনেক বড় গুনাহ করে যেতে থাকবে।

তাহলে এ হাদীসের আলোকে বলা যায় যে, কুরআনের জ্ঞান থাকা সবচেয়ে বড় সাওয়াব বা সবচেয়ে বড় ফরজ এবং কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ।

তথ্য- ৫

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ رَسُولُ اللهِ (ص) اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ تِلاَوَاةُ الْقُرْانِ.

অর্থ: আনাস (রা:) হতে বর্ণিত- রাসূল (সা:) বলেছেন, কুরআন তেলাওয়াত করা (কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা) সর্বোত্তম ইবাদত।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: কানযুল ওম্মাল, হাদিস নং ২২৬৩)

তথ্য- ৬

عَنْ نُعْمَان بِن بَشِيْر قَالَ رَسُوْلُ الله اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ اُمَّتِىْ تِلاَوَةُ الْقُرْأَنِ.

অর্থ: নুমান বিন বশীর (রা:) হতে বর্ণিত- আমার উম্মতের জন্য কুরআন তেলাওয়াত সর্বোত্তম ইবাদাত।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: কানযুল ওম্মাল, হাদিস নং ২২৬৪)

ব্যাখ্যা: তেলাওয়াত শব্দের অর্থ হলো অধ্যয়ণ করা। তাই হাদীসখানিতে রাসূল (সা:) বলছেন, কুরআন অধ্যয়ন করা তথা কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা সর্বোত্তম ইবাদত। যেটি সর্বোত্তম ইবাদত সেটিই সবচেয়ে বড় সাওয়াবের কাজ। তাই হাদীসখানির বক্তব্য হলো- কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা সবচেয়ে বড় সাওয়াবের কাজ।

এ হাদীসের আলোকেও তাই বলা যায় যে, কুরআনের জ্ঞান থাকা সবচেয়ে বড় সাওয়াব বা সবচেয়ে বড় ফরজ এবং কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ।

তথ্য- ৭

وَعَنْ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلاَ إِنَّهَا سَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ فَقُلْتُ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ كِتَابُ اللهِ فِيْهِ نَبَأُ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى

فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللهُ وَهُوَ حَبْلُ اللهِ الْمَتِيْنُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيْمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ هُوَ الَّذِي لاَ تَزِيْغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ وَلاَ تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَلاَ تَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلاَ يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلاَ تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ هُوَ الَّذِيْ لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوْا (إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِه) مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِىَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ.

অর্থ: আলী (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান থাক! অচিরেই অশান্তির সৃষ্টি হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, তা হতে বাঁচার উপায় কী? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব, যাতে তোমাদের পূর্ব পুরুষদের ঘটনা বিদ্যমান এবং ভবিষ্যৎ কালের খবরও বিদ্যমান। আর তাতে তোমাদের জন্যে উপদেশাবলী ও আদেশ- নিষেধ রয়েছে, তা তোমাদের মধ্য থাকা বিবাদের (সত্য এবং অসত্যের) ফয়সালা দানকারী এবং তা উপহাসের বস্তু নয়। যে কেউ তাকে অহংকারপূর্বক পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন। আর যে ব্যক্তি তাঁর হিদায়াত ছাড়া অন্য হিদায়াতের সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন। তা (কুরআন) আল্লাহর দৃঢ় রশি, মহাজ্ঞানীর বক্তব্য ধারণকারী গ্রন্থ এবং সহজ ও সরল পথের দিকনির্দেশ দানকারী। যা দ্বারা মানুষের অন্তর কলুষিত হয় না, মানুষ সন্দেহে পতিত হয় না এবং ধোঁকা খায় না। তা দ্বারা আলেমগণ তৃপ্তি লাভ করে না (আলেমগণের তা থেকে জ্ঞান লাভ করা শেষ হয় না)। বারবার তা পাঠ করলেও পুরানো হয় না, তার অভিনবত্বের শেষ হয় না। যখনই জীন জাতি তা শুনল, তখনই সাথে সাথে তারা বলল, নিশ্চয়ই আমরা আশ্চর্য কুরআন শুনেছি, যা সৎ পথের দিকে লোককে ধাবিত করে। সুতরাং আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। যে ব্যক্তি কুরআন মোতাবেক কথা বলল, সে সত্যই বলল। যে তাতে আমল করল সে সওয়াব পেল। যে কুরআন মোতাবেক হুকুম করল সে ন্যায়- বিচার করল। যে ব্যক্তি কুরআনের দিকে মানুষকে ডাকবে, সে সৎ পথ প্রাপ্ত হবে।

(মাকতাবাতুশ শামেলাহ: তিরমিয, হাদীস নং ২৯০৬)

ব্যাখ্যা: এ হাদীসখানিতে থাকা পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত তথ্যগুলো হলো-

ক. কুরআন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে ফয়সালাকারী। অর্থাৎ কুরআনের বক্তব্যের বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

খ. যে ব্যক্তি কুরআনের হিদায়েত ছাড়া অন্য হিদায়েত সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন। অর্থাৎ কুরআনের বক্তব্যের সাথে সঙ্গতিশীল নয় এমন কোন বক্তব্য অন্য কোন গ্রন্থ বা ব্যক্তি থেকে গ্রহণ ও অনুসরণ করলে ব্যক্তি ভুল পথে চলে যাবে। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকাহ, ফাজায়েলে আমল, বিজ্ঞান অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি যাই হোক না কেন।

তাই, এ হাদীসখানি থেকে বুঝা যায় যে, একজন মানুষকে জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করতে হলে এবং সঠিক আমল করতে হলে প্রথমে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তাই, এ হাদিসখানি অনুযায়ীও কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা সবচেয়ে বড় ফরজ এবং কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ।

তথ্য- ৮

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ(رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ وَفَضْلُ كَلاَمِ اللهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلاَمِ كَفَضْلِ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ.

অর্থ: আবু সাঈদ (রা:) হতে বর্ণিত রাসূল (সা:) বলেছেন আমার রব বলেন যারা কুরআন নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে (অন্যভাবে) আমার (নফল) যিকির করা ও আমার নিকট দোয়া করার সুযোগ পায় না আমি তাদের দোয়াকারীর চেয়ে উত্তম প্রতিদান দিব। আল্লাহর কালাম (কুরআন) সকল কালামের চেয়ে উত্তম। যেমন সকল সৃষ্টির চেয়ে আল্লাহ উত্তম।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: তিরমিযী, হাদিস নং ২৫৬১)

ব্যাখ্যা: কুরআন নিয়ে ব্যস্ত থাকার অর্থ হলো কুরআনের জ্ঞান অর্জন, গবেষণা ও দাওয়াত নিয়ে ব্যস্ত থাকা। তাহলে হাদীসখানিতে প্রথমে বলা হয়েছে কুরআনের জ্ঞান অর্জন, গবেষণা ও দাওয়াত নিয়ে ব্যস্ত থাকার সওয়াব বা কল্যাণ অন্য আমলের চেয়ে বেশী।

হাদীসখানির শেষে বলা হয়েছে কুরআনের মর্যাদা অন্য কালামের মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য, আল্লাহ ও অন্য সৃষ্টির মধ্যকার পার্থক্যের সমান। আল্লাহ ও অন্য সৃষ্টির মধ্যকার পার্থক্য অপরিসীম। তাই, হাদীসখানির এ অংশের আলোকে বলা যায় যে, কুরআনের জ্ঞান অর্জনের সওয়াব অন্য সকল আমলের চেয়ে অপরিসীমভাবে বেশী এবং কুরআনের জ্ঞান না থাকা, শিরক ও অন্য গুনাহর চেয়ে অনেক বড় গুনাহ।

তথ্য- ৯

عَنْ اَبِیْ اُمَامَةَ اَلْبَاهِلِیِّ قَالَ ذُكِرَ لِی رَسُولِ اللهِ (ص) رَجُلاَنِ اَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْاٰخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُولِ اللهِ (ص) فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِیْ عَلَى اَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ (ص) اِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَه وَاَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِی جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ.

অর্থ: হজরত আবু উমামা বাহেলী (রা:) বলেন, রাসূল (সা:) এর নিকট দুজন লোকের (মর্যাদা) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হল। একজন আবেদ (জ্ঞানহীন আমলকারী) এবং অপরজন আলেম (জ্ঞানী আমলকারী)। রাসূল (সা:) বললেন, আবেদের উপর আলেমের মর্যাদা তেমন যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের মধ্যকার সাধারণ একজন মুসলিমের উপর। অত:পর রাসূল (সা:) বলেন, আল্লাহ্, ফেরেশতাগণ, আকাশ ও পৃথিবীর সকল কিছু, এমনকি পিপীলিকা তার গর্ত থেকে এবং মৎসকুল দোয়া করতে থাকে জ্ঞানী ব্যক্তির জন্যে, যে মানুষকে ভাল (সত্য) কথা শিক্ষা দেয়।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: তিরমিযি, হাদীস নং ২৬৮৫)

ব্যাখ্যা: রাসূল (সা:) ও একজন সাধারণ মুসলমানের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য অপরিসীম। তাই হাদীসখানির মাধ্যমে রাসূল (সা:) পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন জ্ঞানসহ আমলকারী আর জ্ঞানহীন আমলকারীর মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য অপরিসীম। কারণ, জ্ঞানী আমলকারী সঠিক আমল করে প্রচুর নেকী অর্জন করবে এবং জ্ঞানহীন আমলকারী ভুল আমল করে প্রচুর গুনাহ কামাই করবে। মর্যাদার এ পার্থক্যের কারণ হলো জ্ঞান। তবে সে জ্ঞান অবশ্যই হতে হবে সঠিক।

জীবন সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ হলো আল- কুরআন। তাই এ হাদীস অনুযায়ীও সবচেয়ে বড় সওয়াবের কাজ হলো কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা। আর সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো কুরআনের জ্ঞান না থাকা।

তথ্য- ১০

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولِ اللهِ (ص) سَاعَةٌ مِنَ الَّيْلِ خَيْرٌ مِنْ اَحْيَاءِهَا.

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন, রাসূল (সা:) বলেছেন, রাতের কিছু অংশ জ্ঞান চর্চা করা গোটা রাত জেগে ইবাদাত করার চাইতে উত্তম।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: সুনানে দারেমী, হাদীস নং ২৬৪)

ব্যাখ্যা: এ হাদীসখানিতে বলা হয়েছে জ্ঞান অর্জনের সাওয়াব অন্য আমলের চেয়ে বেশী। তাই এ হাদীসখানির ব্যাখ্যা থেকেও বলা যায় কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ।

❑❑ তাহলে হাদীসের বক্তব্য থেকেও নিশ্চতভাবে জানা যায় যায় যে-

- ❖ শিরক অতিবড় গুনাহ
- ❖ কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ

তাহলে দেখা যায় যে সবচেয়ে বড় গুনাহর বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়ের সমর্থনকারী অনেক হাদীস উপস্থিত আছে।

সবচেয়ে বড় গুনাহগার না হওয়ার জন্য কুরআনের যে পরিমান জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে, কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ। প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, সবচেয়ে বড় গুনাহগার না হওয়ার জন্য কুরআনের কি পরিমাণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন? চলুন জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী এখন এ বিষয়টি জানা যাক।

Common sense (আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান)

কোন বিষয়ের সকল মূল (প্রথম স্তরের মৌলিক) বক্তব্য যদি একটি গ্রন্থের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে তবে Common sense এর সর্বসম্মত রায় হবে ঐ বিষয়টি পালন করে সফল হতে হলে একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই পুরো গ্রন্থটি পড়ে সকল মূল তথ্য জেনে নিতে হবে। কারণ, একটি মাত্র মূল জ্ঞান ও আমলে ভুল থাকলে অন্য সকল আমল ব্যর্থ হয়ে যাবে।

ইসলামের সকল মূল বা প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় ছড়িয়ে আছে পুরো কুরআন জুড়ে। তাই Common sense এর সর্বসম্মত রায় অনুযায়ী একজন মুসলমানের জীবন পরিচালনা করে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে হলে তাকে অবশ্যই

পুরো কুরআনের জ্ঞান অর্জন ও সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। দুচারটি বা কয়েকটি সূরা মুখস্থ থাকলে বা তার বক্তব্য জানা থাকলে চলবে না।

জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী কোন বিষয়ে Common sense এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাহলে আলোচ্য বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- একজন মুসলমানকে পুরো কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

আল- কুরআন

তথ্য- ১

أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ ط

অর্থ: তোমরা কি এই কিতাবের (কুরআনের) কিছু অংশ বিশ্বাস করবে, আর কিছু অংশ অবিশ্বাস করবে? যারা এরকম করবে, দুনিয়ায় তাদের বদলা হবে দূর্ভোগ- লাঞ্ছনা। আর আখেরাতে তাদের পৌঁছে দেয়া হবে কঠিনতম শাস্তির দিকে।

(বাকারা/২:৮৫)

ব্যাখ্যা: জ্ঞান না থাকলে বিশ্বাসের বস্তুটি অনুপস্থিত থাকে বলে বিশ্বাসও নেই। আবার বিশ্বাস না থাকলে জ্ঞানের কোন মূল্য নেই। অন্যদিকে কোন ব্যক্তি মনে-প্রাণে কিছু বিশ্বাস করলে তা তার আমলে অবশ্যই প্রকাশ পাবে। তাই আল্লাহ এখানে বলছেন, যারা কুরআনের কিছু জানে, বিশ্বাস করে ও অনুসরণ করে আর কিছু জানেনা, অবিশ্বাস করে ও অনুসরণ করে আর কিছু জানে না, বিশ্বাস এবং অনুসরণ করে না, তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে যথাক্রমে লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ এখানে জানিয়ে দিয়েছেন যে, প্রত্যেক মুসলমানকে কুরআনের পুরোটাই জানতে হবে, বিশ্বাস এবং অনুসরণ করতে হবে।

তথ্য- ২

إِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ ۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ ط وَأَمْلَى لَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللهُ

سَنُطِيْعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ج وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوْا مَا أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.

অর্থ: হেদায়েত সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হওয়ার পর যারা তা হতে ফিরে যায়, তাদের জন্যে শয়তান ঐরূপ আচরণকে সহজ বানিয়ে দিয়েছে এবং মিথ্যা আশা- আকাঙ্ক্ষার ধারা তাদের জন্যে দীর্ঘ করে দিয়েছে। এটা এ জন্যে যে, তারা আল্লাহর নাযিল করা বিষয়কে (কিতাব বা দ্বীনকে) অস্বীকারকারীদের বলে, কোন কোন বিষয়ে আমরা তোমাদের অনুসরণ করব। আল্লাহ তাদের গোপন কথা ভালো করেই জানেন। তাহলে তখন কী হবে যখন ফেরেশতাগণ তাদের রুহগুলোকে কবজ করবে এবং তাদের মুখ ও পিঠের ওপর মারতে থাকবে। এটাতো এ কারণেই যে, তারা আল্লার অসন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করাকে পছন্দ করেছে এবং তাঁর সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করাকে অপছন্দ করেছে। এ কারণে তিনি তাদের সকল আমল নিষ্ফল করে দিবেন।

(মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৫- ২৮)

ব্যাখ্যা: প্রথম আয়াতটিতে আল্লাহ কিতাবের মাধ্যমে হেদায়েত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাওয়ার পর যারা তা থেকে ফিরে যায় তাদের কিছু অবস্থা বলেছেন। আর দ্বিতীয় আয়াতটিতে এই ফিরে যাওয়া বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন তা বলে দিয়েছেন। ফিরে যাওয়া বলতে বুঝানো হয়েছে- জীবনের কিছু কিছু ব্যাপারে আল্লাহর কিতাবের বক্তব্যকে অনুসরণ করা আর কিছু কিছু ব্যাপারে অন্য কারো (গায়রুল্লাহ্) কথা অনুসরণ করা। এই ধরনের আচরণের ব্যাপারে এ আয়াত ক' টিতে যা বলা হয়েছে তা হলো-

১. ঐ ধরনের আচরণের জন্যে শয়তান তাদের সামনে মিথ্যা আশা- আকাঙ্ক্ষার ধারা প্রশস্ত করে দিয়েছে। অর্থাৎ শয়তান তাদের ধারণা দিয়েছে, ঐ রকম আচরণ করলেও তারা সফলকাম হবে এবং ইহকাল ও পরকালে সুখে- শান্তিতে থাকতে পারবে।
২. ঐ ধরনের আচরণের জন্যে মৃত্যুকালে ফেরেশতারা মুখে ও পিঠে আঘাত করে তাদের জর্জরিত করবে।
৩. ঐ আচরণের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে পছন্দ করা এবং সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করা।
৪. ঐ রকম আচরণের জন্যে তাদের সকল আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে।

অনুসরণ করতে হলে আগে জানতে হবে। এ আয়াত ক' টির তথ্যগুলো থেকেও তাই স্পষ্ট বুঝা যায়, আল্লাহর দেয়া কিতাবের কিছু জানলে আর কিছু না জানলে পুরো জীবনটাই দুনিয়া ও পরকালে বিফলে যাবে।

❑❑ তাহলে আলোচ্য বিষয়ের প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী ঐ প্রাথমিক রায় হবে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। অর্থাৎ ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো- একজন মুসলমানকে পুরো কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তাই, সবচেয়ে বড় গুনাহগার না হওয়ার জন্য একজন মুসলিমের পুরো কুরআনের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

সকলকে কুরআনের সাধারণ জ্ঞানী না বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী হতে হবে?

চলুন জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী এ বিষয়টিও জেনে নেয়া যাক।

Common sense (আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান)

যে কোন বিষয়ের জ্ঞানী ব্যক্তিরা নিম্নোক্ত তিনভাগে বিভক্ত থাকে-

১. সাধারণ জ্ঞানী
২. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী
৩. জ্ঞানী নয়

সাধারণ জ্ঞানী বলা হয়, সেই ব্যক্তিকে যে ঐ গ্রন্থ বা বিষয়ে উপস্থিত থাকা সকল দিকের মৌলিক জ্ঞান রাখে। **বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী** বলা হয় সেই ব্যক্তিকে যার বিষয়টিতে উপস্থিত থাকা সকল দিকের মৌলিক জ্ঞান ছাড়াও এক বা একাধিক দিকের বিস্তারিত জ্ঞান আছে। আর **জ্ঞানী নয়** ধরা হয় সেই ব্যক্তিকে যার ঐ বিষয়ে উল্লেখ থাকা কোন একটি দিকের মৌলিক জ্ঞানের অভাব থাকে।

একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হবে। ডাক্তারী বিদ্যায় বিভিন্ন বিষয় আছে। যেমন- মেডিসিন, সার্জারি, গাইনী, চক্ষু, চর্ম, নিউরো, অর্থোপেডিক, এনাটমি, ফিজিওলজি, প্যাথলজি ইত্যাদি। এমবিবিএস (MBBS) পর্যায় পর্যন্ত একজন ডাক্তারকে ঐ সকল বিষয়ের মৌলিক জ্ঞানটুকু

অর্জন করতে হয়। আর তাই, চিকিৎসা বিদ্যায় সাধারণ প্র্যাকটিস (General Practice) করতে হলে MBBS পাশ করে একজন ডাক্তারকে চিকিৎসা বিদ্যায় সাধারণ জ্ঞানী অবশ্যই হতে হয়। এরপর কেউ কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ (Specialist) হতে চাইলে তাকে ঐ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা নিতে হয়। আর ডাক্তারী বিদ্যার কোন একটিও দিকে যার মৌলিক জ্ঞানের অভাব থাকে তাকে ডাক্তারী পাশ করান হয় না বা ডাক্তার বলা হয় না। অন্যদিকে একটি সমাজে যদি কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক না থাকে তবে সে সমাজ চিকিৎসা বিজ্ঞানের পুরো কল্যাণ পাবে না। এগুলো চিরসত্য কথা।

আল- কুরআনে উল্লেখ আছে, মানুষের দুনিয়ার জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলভাবে পরিচালনা করার জন্যে যত বিষয় দরকার তার সকল বিষয়ের মূল (প্রথম স্তরের মৌলিক) তথ্যসমূহ। তাই কুরআনের সাধারণ জ্ঞানী বলা যাবে সেই ব্যক্তিকে যে পুরো কুরআন অধ্যয়ন করে জীবনের প্রতিটি দিকের উল্লিখিত সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়গুলো জেনেছে এবং ঐ সকল বিষয়গুলো (বিশেষ করে বিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদি) সাধারণভাবে বুঝার জন্য কুরআনের বাইরেরও কিছু জ্ঞান তার আছে। আর কুরআনের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী হবেন সেই ব্যক্তি যিনি কুরআনের সাধারণ জ্ঞান অর্জনসহ কুরআনে উল্লিখিত কোন একটি বিষয়ে (হাদীস, ফিকাহ, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি) আরো উচ্চতর (বিস্তারিত) জ্ঞান অর্জন করেছেন। আর যে ব্যক্তির কুরআনে উপস্থিত কোন একটি বিষয়ের মৌলিক জ্ঞানের অভাব আছে তাকে কুরআনের জ্ঞানী বলা যাবে না।

তাই Common sense অনুযায়ী কুরআনের সাধারণ জ্ঞানী হওয়া সকল মু' মিনের সবচেয়ে বড় ফরজ ।কিন্তু বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী হওয়া সকলের জন্যে ফরজ নয় (ফরজে কিফায়া)। তবে সমাজে কুরআনের কিছু বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী অবশ্যই থাকতে হবে। তা না হলে কুরআনের পরিপূর্ণ কল্যাণ থেকে সমাজ বঞ্চিত হবে।

চেষ্টার পরও কুরআনের সাধারণ জ্ঞানী না হতে পারলে কি শাস্তি পেতে হবে?

ইসলামের নীতি হলো কোনো আমল কেউ একশতভাগ সফলভাবে করতে পেরেছে কিনা এটি বিচার্য বিষয় হবে না। বিচার্য বিষয় হল ব্যক্তি আমলটি সম্পাদন করার জন্য নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা করেছে কিনা সেটি। কারণ, একটি কাজ সঠিকভাবে সম্পাদিত হওয়ার জন্য অসংখ্য অনুঘটক (Factor) থাকে। ঐ

অনুঘটকের সবকটির ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া ব্যক্তির জন্য সম্ভব নাও হতে পারে। এর বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে নবী- রাসূলদের (আ:) জীবন। নবী-রাসূলগণকে আল্লাহ দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়ায় বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে মানুষকে দেখিয়ে দিতে। কিন্তু যতোদূর জানা যায়, মাত্র হাতেগনা কয়েকজন ঐ কাজে সফল হয়েছিলেন। তাহলে কি বাকি সবাই দোযখে যাবেন? না তা অবশ্যই যাবেন না। কারণ, তাঁরা সে কাজে সফল হওয়ার জন্যে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন।

তাই একজন মানুষ কুরআনের যথাযথ সাধারণ জ্ঞানী হতে পেরেছিল কিনা, সেটি পরকালে আল্লাহর বিচার্য বিষয় হবে না। তিনি দেখবেন, ব্যক্তিটি কুরআনের সাধারণ জ্ঞানী হওয়ার জন্য নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা করেছিল কিনা। যারা এ চেষ্টাই করবে না, তাদের অবশ্যই মৃত্যুর পর কঠিন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে। যাদের লেখাপড়া করার কোন সুযোগ হয় নাই তাদের ব্যাপারে আল্লাহ নমনীয় থাকবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা যারা শিক্ষিত এবং যারা অন্যভাষার বই পড়ে ডিগ্রী অর্জন করেছি তাদের এ বিষয়ে কোন ছাড় যে আল্লাহ দিবেন না, এটি নিশ্চিত করেই বলা যায়।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে, কোনো ব্যক্তি যদি নিষ্ঠার সঙ্গে চেষ্টা করে তবে সে কুরআনের অন্তত এতটুকু জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবে যে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর ব্যাপারে শয়তান তাকে ধোঁকা দিতে পারবে না।

অন্যদিকে কুরআনের সাধারণ জ্ঞানী হতে হলে আরবী গ্রামারের পন্ডিত হওয়ার দরকার পড়ে না। বর্তমানে পৃথিবীর সকল ভাষায় কুরআনের তরজমা বের হয়েছে। তাই কোন একটি ভাল তরজমা কয়েকবার পড়ে নিলে যেকোন ব্যক্তির পক্ষে কুরআনের সাধারণ জ্ঞানী হওয়া খুবই সম্ভব।
উদাহরণ স্বরুপ বলা যায়, ঢাকায় ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন (IERF) নামের একটি সংস্থা 'মু'জামুল কুরআন' নামে একখানি তরজমা গ্রন্থ বের করেছে। এ তরজমায় যারা অন্যতম ভূমিকা রেখেছেন তাদের মধ্যে একজন হলো ডাক্তার। ঐ ডাক্তার তরজমায় ভূমিকা রাখার সময়কালে কুরআন পড়তেও পারতেন না। আল- কুরআনের একখানি বাংলা তরজমা ঐ সময় পর্যন্ত প্রায় ৩০ (তিরিশ) বার খতম দিয়ে তিনি ঐ অসামান্য যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

তবে আল- কুরআনের সহীহ তেলাওয়াত শিখার চেষ্টা সকল মুসলিমের অবশ্যই করতে হবে। আর বর্তমানে কুরআন বুঝার জন্য, চলার মত আরবী গ্রামার শিখার বহু সহজ কোর্স বাংলাদেশসহ সকল মুসলিম দেশে চালু আছে। তবে সকলকে মনে রাখতে হবে, কুরআনের আরবী আয়াতে কোন ভুল নেই কিন্তু বাংলা তরজমায় ভুল থাকতেও পারে। তাই তরজমা পড়ার সময় সকলকে চোখ খোলা রাখতে হবে। এ বিষয়ে আমাদের রচিত 'কুরআনের তরজমা (অর্থ) ও তাফসীর (ব্যাখ্যা) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা' শিরনামের বইটি সকলকে পড়া দরকার।

শিরকের সংজ্ঞা, শ্রেণী বিভাগ ও বর্তমান বিশ্বে শিরক করার ব্যাপকতা

উপরের আলোচনা থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে জেনেছি যে, শিরক কোন ছোটখাট গুনাহ নয়। শিরক 'অতিবড়' একটি কবীরা গুনাহ। তাই সকল মুসলিমকে অবশ্যই শিরক থেকে মুক্ত থাকতে হবে। আর শিরক করা থেকে মুক্ত থাকতে হলে আগে শিরক সম্বন্ধে জানতে হবে। তাই চলুন, শিরক সম্বন্ধে কিছু কথা এখন জেনে নেয়া যাক।

শিরকের সংজ্ঞা

শিরক শব্দের অর্থ হচ্ছে অংশীদারিত্ব। তাই শিরকের সংজ্ঞা হলো- যে সব বিষয় শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত, সে সব বিষয়ে অন্য কারো অংশীদারিত্ব আছে, এ বিষয়টি কথা বা কাজের মাধ্যমে স্বীকার করা।

শিরকের শ্রেণীবিভাগ এবং ব্যাপকতা

শিরক চার ধরণের-

১. আল্লাহর সত্তার সাথে শিরক
২. আল্লাহর গুণাবলীর সাথে শিরক
৩. আল্লাহর হক বা অধিকারের সাথে শিরক
৪. আল্লাহর ক্ষমতার সাথে শিরক

১. আল্লাহর সত্তার সাথে শিরক

আল্লাহ একের অধিক বা তাঁর স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে ইত্যাদি আছে এ কথা বলা বা স্বীকার করলে এ ধরণের শিরক করা হয়। মুসলমানরা এ ধরনের শিরক থেকে মুক্ত আছে বলা যায়।

২. আল্লাহর গুণাবলীর সাথে শিরক

যে সকল গুণ শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত, সে গুণ অন্য কারো আছে এটি বলা, স্বীকার করা বা সে অনুযায়ী কাজ করা এ ধরণের শিরকের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- সব জায়গায় উপস্থিত থাকা, সব কথা শুনতে পাওয়া, গায়েব জানা ইত্যাদি গুণ শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত। অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্তার এ ধরণের গুণ আছে, এটি মনে করা বা সেই অনুযায়ী কাজ করা শিরক। তাই সে ব্যক্তি বা সত্তা জীবিত বা মৃত কোন নবী- রাসূল (আ:), অলি- আউলিয়া, পীর, বুজুর্গ বা অন্য কেউ হোক না কেন। এ ধরনের শিরক বর্তমান কালের মুসলমানদের মধ্যে বেশ দেখা যায়।

৩. আল্লাহর হক বা অধিকারের সাথে শিরক

যে সকল জিনিস পাওয়ার হক শুধুমাত্র আল্লাহর তা অন্য কাউকে দিলে বা অন্য কারো তা পাওয়ার হক আছে- এটি স্বীকার করা এ ধরণের শিরকের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, সেজদা পাওয়ার হক শুধুমাত্র আল্লাহর। তাই কেউ যদি কোন মাজার বা অন্য কোথাও গিয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করে, তবে সে শিরক করল। এ ধরনের শিরক মুসলমানদের মধ্যে বর্তমানে কম হলেও আছে।

৪. আল্লাহর ক্ষমতার সাথে শিরক

ক. আল্লাহর সাধারণ ক্ষমতার সাথে শিরক

হায়াত- মউত, রিজিক, ধন- দৌলত, সম্মান, সন্তান- সন্ততি ইত্যাদি দেয়া এবং গুনাহ মাফ করার স্বাধীন ক্ষমতা শুধু আল্লাহর। পৃথিবীর জীবিত বা মৃত কোন ব্যক্তি বা সত্তার আল্লাহর নিকট থেকে ঐগুলো জোর করে এনে দেয়ার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নেই। কেউ যদি বিশ্বাস করে জীবিত বা মৃত কোন ব্যক্তি বা সত্তা, জোর করে বা অনুরোধ করে ঐগুলো আল্লাহর নিকট থেকে এনে দেয়ার ক্ষমতা রাখে, তাহলে নি:সন্দেহে আল্লাহর ক্ষমতার সঙ্গে শিরক করা হবে। মানুষ ক্ষমতাবান কোন ব্যক্তির নিকট থেকে কিছু পাওয়ার আশায় দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির পিছনে অর্থ- সম্পদ বা শ্রম তখনই শুধু ব্যয় করে যখন সে নিশ্চিত হয় যে, দ্বিতীয় ব্যক্তির খুশি হয়ে চেষ্টা করলে ক্ষমতাবান ব্যক্তি নিকট থেকে তার কাঙিক্ষত বস্তুটি অবশ্যই এনে দিতে পারবে। তদ্রুপ, আল্লাহর নিকট থেকে কিছু পাওয়ার আশায় জীবিত বা মৃত কোন ব্যক্তিকে (পীর, বুজুর্গ, দরবেশ ইত্যাদি) নজর- নিয়াজ বা শ্রম (হাত- পা টিপা ইত্যাদি) মানুষ শুধু তখনই দেয়, যখন সে বিশ্বাস করে, ঐ ব্যক্তি খুশি হয়ে চেষ্টা করলে তার কাঙিক্ষত বস্তুটি আল্লাহর নিকট থেকে অবশ্যই এনে দিতে পারবে। এটি অবশ্যই শিরক। বর্তমানে মুসলমান সমাজে এই ধরনের শিরক কম- বেশি চালু আছে।

খ. আল্লাহর আইন বানানোর ক্ষমতার সাথে শিরক

পবিত্র কুরআনের সূরা ইউসুফের ৪০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন-

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ

অর্থ: হুকুম করার ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহর।

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ এই আয়াত ও আরো আয়াতের মাধ্যমে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, হুকুম করার ক্ষমতা শুধুমাত্র তাঁর। হুকুম মানে আইন, আবার আইন মানে হুকুম। তাহলে আল্লাহ এখানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছেন যে, আইন বানানোর সার্বভৌম বা স্বাধীন ক্ষমতা শুধু তাঁর। পৃথিবীর আর কোন সত্তার আইন বানানোর ব্যাপারে স্বাধীন ক্ষমতা নেই। চাই সে সত্তা আইন পরিষদ (Parliament), সিনেট, হাউজ অব কমন্স, হাউজ অব লর্ডস, লোকসভা, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, বাদশাহ যেই হোক না কেন। এই সব সত্তার আইন প্রণয়নের ব্যাপারে ক্ষমতা শুধু এতটুকু যে, যে সকল ব্যাপারে আল্লাহ স্পষ্ট আইন দেননি, সেগুলোর ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করা। কিন্তু তা অবশ্যই আল্লাহর দেয়া কোন স্পষ্ট আইনের পরিপন্থী হতে পারবে না। কেউ যদি ঐ সব সংস্থা বা সত্তাকে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী, এ কথা ভোট বা সমর্থনের মাধ্যমে স্বীকার করে নেয় বা তাদের বানানো (আল্লাহর আইনের বিরোধী) আইনকে খুশি মনে মেনে চলে, তবে সে অবশ্যই আল্লাহর আইন বানানোর ক্ষমতার সাথে শিরক করল।

এটিই হচ্ছে সেই শিরক, যেটি বর্তমান বিশ্বে মুসলমানরা সব চেয়ে বেশি করছে। বর্তমানে বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর ২/১টি ছাড়া সব ক'টিতে কুরআন বিরোধী আইন চালু আছে। অধিকাংশ মুসলমান সমর্থন করেছে বলেই এটি চালু হতে পেরেছে। আর বেশির ভাগ মুসলমান খুশি মনে মেনে চলছে বলে এটি চালু থাকতে পারছে। তাই না বুঝে হোক, আর বুঝে হোক পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলমান আজ এই শিরকটি করছে, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

মানুষের জীবন পরিচালনার আইনগুলো বানিয়ে আল্লাহ তা জানিয়ে দিয়েছেন পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে। আর রাসূল (সা:) সেগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করে মানুষকে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই কুরআনে বলা আছে, এমন হুকুম বা আইনের পরিপন্থী কোন আইন বানানোর ক্ষমতা কোন সত্তা বা সংস্থার নেই। যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা এরকম আইন প্রণয়ন করে এবং তা মানুষকে মানতে বাধ্য করে, কুরআনের ভাষায় তাদের বলা হয়েছে 'তাগুত'। এটি হচ্ছে ইসলামকে অস্বীকার করার (কুফরীর) সাধারণ পর্যায়ের চেয়ে খারাপ পর্যায়। আর যে সব মুসলমান ইসলাম বিরোধী আইন প্রণয়নের জন্যে ভোট বা সমর্থনের মাধ্যমে তাগুতকে

ক্ষমতায় বসায় বা খুশি মনে তাগুতের বানানো আইন মেনে চলে, তারা নি:সন্দেহে নিজেদের ঐ পর্যায়ের কুফরীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে।

শেষ কথা

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ, আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, পুস্তিকায় উল্লিখিত কুরআন, হাদীস ও Common sense এর তথ্যগুলো পর্যালোচনা করলে সহজেই বুঝা যায় যে, শিরক হলো অতিবড় গুনাহ এবং কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ। আর তথ্যগুলোর আলোকে এ বিষয়টি শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায়। কিন্তু অবাক কান্ড হলো প্রায় সব মুসলমান জানে শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ এবং কুরআনের জ্ঞান না থাকা তেমন কোন গুনাহ নয়।

এক গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলমানদের মূল জ্ঞানে এটিসহ অনেক ভুল তথ্য ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। আর মূল জ্ঞানে ভুল ঢুকে যাওয়ার কারণে পৃথিবীর এক সময়ের শ্রেষ্ঠ মুসলিম জাতি আজ চরম অধ:পতিত জাতিতে পরিণত হয়েছে। কি পদ্ধতিতে এ ভুল ঢুকানো ও স্থায়ী করার ব্যবস্থা করা হয়েছে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে, 'যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার মূল জ্ঞানে ভুল ঢুকানো হয়েছে' নামক বইখানিতে। এ ষড়যন্ত্রে শুধু মুসলমানদের ক্ষতি হয়নি। সমগ্র মানব সভ্যতা আজ এর ফল ভোগ করছে। ঐ ঢুকিয়ে দেয়া মৌলিক ভুল তথ্যগুলো এতো ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য করা হয়েছে যে তা সংস্কার করা ২-৪ জন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। অধিকাংশ মুসলমান যদি এ ব্যাপারে এগিয়ে আসে তবেই তা সম্ভব হবে। আমরা সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আপনারও ঈমানী দায়িত্ব এ ব্যাপারে এগিয়ে আসা । মহান আল্লাহ আমাদের ও আপনাকে সে শক্তি ও সামর্থ দিক এ দোয়া করি।

পুস্তিকায় কোন ভুল ধরা পড়লে আমাদের জানাবেন। সঠিক হলে তা শুধরিয়ে নেয়া হবে ইনশাআল্লাহ। আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ।

সমাপ্ত

লেখকের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য
২. রাসূল মুহাম্মাদ (সা:) কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বুঝার মাপকাঠি
৩. নামাজ কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু' মিনের একনাম্বার কাজ এবং শয়তানের এক নাম্বার কাজ
৫. আমল কবুলের শর্তসমূহ
৬. বিবেক- বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ না বুঝে কুরআন পড়া সওয়াব না গুনাহ?
৮. ইসলামের মৌলিক বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস নির্ণয়ের সহজতম উপায়
৯. ওযু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কি?
১০. কুরআনের পঠন পদ্ধতি- প্রচলিত সুর না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসঙ্গত ও কল্যাণকর আইন কোনটি?
১২. ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনে কুরআন হাদীস ও বিবেক- বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. মু' মিন ও কাফিরের সংজ্ঞা এবং শ্রেণীবিভাগ
১৫.' ঈমান থাকলেই বেহেশত পাওয়া যাবে' বর্ণনাসম্বলিত হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা
১৬. শাফায়াত দ্বারা কবীরা গুনাহ ও দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. ' তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্বনির্ধারিত' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীস শাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু' মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য শিরক বা কুফরী নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবার বা সমাজে মানুষের অজানা মু' মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কিনা?
২৪. ' আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. কুরআনের তাফসীর করা বা তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি

২৭. ‘ মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্বনির্ধারিত’ তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড় গুনাহ- শিরক করা, না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী বিষয়ে লেকচার, ওয়াজ বা বক্তব্য উপস্থাপনের ফর্মুলা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার মূল জ্ঞানে ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১.‘ আল কুরআনে রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে’ প্রচলিত এ কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. ফিকাহ শাস্ত্রের সংস্করণ বের করা মুসলিম জাতির জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কী?

প্রাপ্তিস্থান

♦ **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
১১, শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ স্মরণী (৮ম তলা)
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপেণ্ডক্স, ঢাকা- ১২১৭।
ফোন: ০২-৯৩৪১১৫০, ০১১৯৯-৪৭৪৬১৭।

♦ **ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল**
১১, শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ স্মরণী (২য় তলা), ঢাকা- ১২১৭।

♦ **আহসান পাবলিকেশন**

কাঁটাবন, মগবাজার, বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন: ৯৬৭০৬৮৬, ৭১২৫৬৬০ ০১৭১১- ৭৩৪৯০৮

♦ **এছাড়াও দেশের অভিজাত লাইব্রেরী সমূহে**।